বাবা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা

বাবা

এতো রক্তের সাথে রক্তের টান
স্বার্থের অনেক ঊর্ধ্বে

আপনার, আমার - সবার কথা...

আমাদের কথা Australia

amaderkotha.com.au অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত মাল্টিকালচারাল অনলাইন নিউজপেপার

amaderkotha.com.au

যারা লিখেছেন...

নাদেরা সুলতানা নদী
আজমুল হক পাপ্পু
অয়ন ইসলাম
নাজমীন মর্তুজা
মাহবুব সিরাজ তুহিন
শৌভনিক দত্ত
রায়হান সাদ ফেরদৌসী
আমজাদ হোসেন
মামুন আলা
শাহানাজ বিথী
ড. মো: ইউনুস

আমাদের কথা

অস্ট্রেলিয়ায় প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম রবিবার পালিত হয় বাবা দিবস। এটি নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ দিন। তবে আমাদের সংস্কৃতি ও পারিবারিক মূল্যবোধে বাবার প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের কাছে প্রতিটি দিনই বাবাকে ভালোবাসার দিন, বাবাকে স্মরণ করার দিন। তারপরও বাবা দিবস অন্য সব দিনের চেয়ে একটু বেশি বিশেষ। এ দিনটিকে ঘিরে পরিবারগুলো একত্রিত হয়, রেস্তোরাঁগুলোতে ভিড় বাড়ে, বিভিন্ন পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্র পরিবারে পরিবারে মুখর হয়ে ওঠে। কার্ডের দোকান, উপহারের দোকান ও ফুলের দোকানগুলোও প্রস্তুত থাকে বাবাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের এই বিশেষ আয়োজনকে ঘিরে।

কিন্তু আমাদের বহুসাংস্কৃতিক ও অভিবাসী কমিউনিটির অনেকের কাছে বাবা দিবসের অনুভূতি আরও গভীর এবং আবেগময়। প্রথম প্রজন্মের অভিবাসী হিসেবে আমাদের অনেকেই বসবাস করছি জন্মভূমি থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে। আমরা এখানে নতুন জীবন গড়ে তুলছি, আমাদের সন্তানরা বড় হচ্ছে এই দেশে; অথচ আমাদের বাবা হয়তো রয়ে গেছেন সেই দূর দেশের বাড়িতে যেখানে আমাদের শৈশব, আমাদের বেড়ে ওঠা এবং জীবনের প্রথম স্বপ্নগুলো গড়ে উঠেছিল।

একদিকে আমাদের বাবা-মা রয়েছেন জন্মভূমিতে, অন্যদিকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম বেড়ে উঠছে অস্ট্রেলিয়ায়। এই দুই প্রজন্মের মাঝখানে তৈরি হওয়া দূরত্ব কখনো কখনো আমাদের হৃদয়ে এক অদৃশ্য শূন্যতা তৈরি করে একটি অনুভূতি, যা হয়তো আজীবন আমাদের আত্মার গভীরে থেকে যাবে।

আমাদের কাছে বাবা শুধু একজন অভিভাবক নন। বাবা আমাদের পরিচয়, আমাদের শেকড়, আমাদের শক্তি। বাবার হাত ধরে আমরা জীবনের প্রথম পথ চলা শিখেছি। তাঁর ত্যাগের ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের অনেক স্বপ্ন বাস্তব হয়েছে। আজ আমরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন, আমাদের ভেতরে বাবার শিক্ষা, ভালোবাসা ও স্মৃতি চিরকাল বেঁচে থাকে।

এই আবেগ ও বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমাদেরকথা অস্ট্রেলিয়া বাবা দিবসকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উদযাপন করছে। বহুসাংস্কৃতিক কমিউনিটির জন্য এই দিনটি শুধু আনন্দ উদযাপনের নয়; এটি আমাদের সঙ্গে থাকা বাবাদের ভালোবাসার, দূরে থাকা বাবাদের স্মরণ করার এবং পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া বাবাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার একটি দিন। এই বিশেষ দিনে পৃথিবীর সকল বাবার প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও শুভকামনা।

আর যাঁদের বাবা আজ আর আমাদের মাঝে নেই, তাঁদের প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক প্রার্থনা। শারীরিকভাবে তাঁরা আমাদের কাছে না থাকলেও তাঁদের ভালোবাসা, ত্যাগ, শিক্ষা ও স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবে। পৃথিবীর সকল বাবাকে জানাই বাবা দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

মাহবুব সিরাজ
প্রধান সম্পাদক

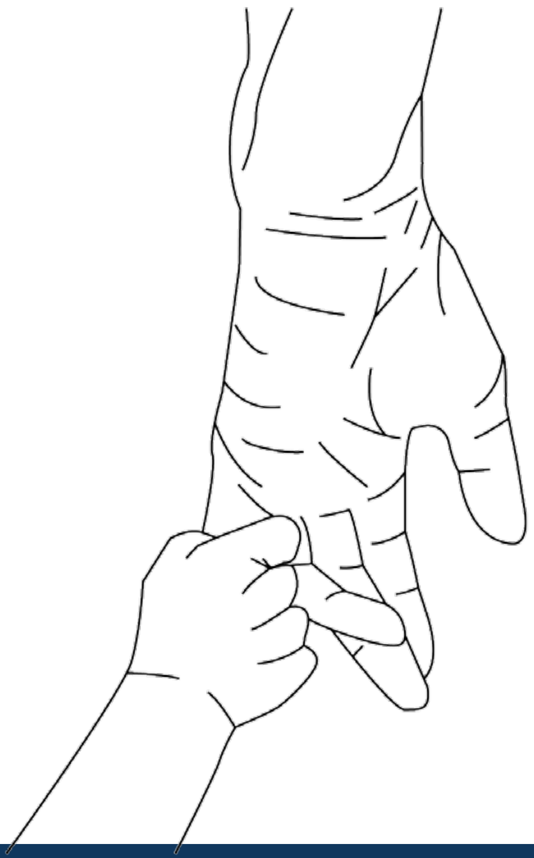

নাদেরা সুলতানা নদী'র

বাবার কাছ থেকে পাওয়া আমার শৈশব কৈশোরের অমূল্য সময়গুলো

> আজকের সামাজিক, পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে যখন দেখাচ্ছে মেয়েদের বেড়ে উঠার সাথে কতকিছুই না সম্পর্কিত, বাধ্যতামূলক, পরিবার, সমাজ চাপিয়ে দিচ্ছে... আর সেই সময়ে আমার মা-বাবা আমাকে, নিজের মত করে ভাবনার একটা জগত গড়তে দিয়েছেন, শিল্প সংস্কৃতির প্রথম পাঠটা দিয়েছেন। যা আমাকে জীবনের এ বেলায় এসেও নানান ভাবে শিখিয়ে দেয় বৈরী সকল আবহাওয়া মোকাবেলার শক্তি হিসেবেই।

নানু বাড়িতে জন্ম আমার। বাবা তখন কর্মস্থলে। জন্মের পর পর, বাবা তাঁর নিজ চোখে দেখার আগেই আত্মীয়ের কাছে শুনলেন আমি দেখতে নাকি মায়াময় হয়েছি এবং যথারীতি আমার মা খালার গায়ের রং পেয়েছি! প্রচলিত ধারণা বা বিশ্বাসে ফর্সা রং হওয়াটা নবজাতকের জন্যে এই সময়ে এসেও ম্যাটার করে আর আমার জন্মসময়টা তো বলাই বাহুল্য। মা খালা রূপবতী। সে অর্থে, জন্মের ঠিক পর সময়ের আমায় দেখে পরিবার পরিজন ধরে নিয়েছিল আমিও বোধ হয়... কিন্তু বাবা নাকি একটু মন খারাপ করেছিলেন এই রকমটা জেনে!

না, সবার সেই ভুল ভেঙ্গে অল্প কিছুদিন পর থেকেই আমি প্রমাণ করে দিলাম আমি বাবার মেয়ে। মানে গায়ের রঙ বদলে বাবার মতোই হতে থাকলো। কালো এক কন্যা সন্তান। যদিও পরিবারের কেউ কেউ তারপরও ভালোবেসে ছোট থেকেই বলতো মেয়ে একটু শ্যামা বরন, বাবা নাকি রীতিমত খুশী হয়েছিলেন এই পরিবর্তনে!

বলে নেই আমি আমার বাবাকে আব্বা বলতাম। আমার ছেলেবেলা কেটেছে হোগলা গ্রামে। এক সময়ের ময়মনসিংহ জেলা এখন নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলায়। আশির দশকের গ্রাম বা তাকে ঘিরে বাজার এবং জীবন যাত্রা যেমন ছিল সেই সময়ের বাংলাদেশের কোন না কোন গ্রামে থাকা মানুষেরা অনেকটাই অনুধাবণ করতে পারবেন। আমি আমার শৈশব কৈশোরের বাবাকে ঘিরে কিছু সময় শেয়ার করবো খুব প্রাসঙ্গিক ভাবেই এই সময়ের সাথে একটা তুলনামুলক চিত্র তুলে ধরবো বলেই। আমাদের বাবারা কেমন করে আমাদের গড়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন এই জগত সংসারের জন্যে এই ভাবনাটা আমি আমার পাঠকদের জন্যে রেখে দিতে চাই!

আমাদের গ্রাম জুড়ে বসবাস ছিল হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান এবং গারো এমন সকল সম্প্রদায়ের। বন্ধুরা ছিল এমন সকল পরিবার থেকে উঠে আসা। একটু বুঝে উঠার পর আমাদের রুটিন ছিল, সকালে উঠে একটু পড়ালেখা, স্কুলে যাবার আগে নদীতে যখন পানি থাকতো ভোঁ দৌড়ে যেতাম খেলার সাথীদের নিয়ে সেখানে ঝাপাঝাপিতে মেতে উঠতে। এরপর স্কুল। বিকেলে বাসায় ফিরে আবার সন্ধ্যা নামার আগ পর্যন্ত আরো একবার খেলায় মেতে উঠা।

শুক্রবার দিনটা হতো একটু অন্যরকম। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেই ভালো একটা জামা, পাজামা আর ওড়না মুড়িয়ে কায়দা/সিফারা নিয়ে পড়তে যেতাম মসজিদের ইমাম, তাঁর কাছে। এরপর বাসায় ফিরেই অপেক্ষা কখন হবে রেডিওতে শিশু কিশোরদের জন্যে অনুষ্ঠান 'কলকাকলি'। দুপুরে রেডিওতে বিজ্ঞাপন তরঙ্গ, সিনেমার এড, গাজী মাযহারুল আনোয়ারের কণ্ঠে মন্ত্রমুগ্ধ কিছু সময় সেই ঘোর নিয়েই কোন কোন দিন আম্মা আব্বা এবং অন্য বড়দের সাথে শুনে ফেলতাম প্রচারিত নাটক বা সৈনিক ভাইদের জন্যে অনুষ্ঠান 'দুর্বার'।

এছাড়া অন্যান্য সকাল এবং রাতে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান হতো, গোলাম মোস্তফা, প্রজ্ঞা লাবণী, কাজী আরিফ এমন

শিল্পীদের ভরাট কণ্ঠের আবৃত্তি। রাতে সেই সময়ের তারকা ফেরদৌসি মজুমদার, রামেন্দ্রু মজুমদার, আলি যাকের, সারা যাকের, রাইসুল ইসলাম আসাদ, সুবর্ণা মুস্তফার মত গুণী শিল্পীদের নিয়ে সাপ্তাহিক নাটক। পরিবারের সবাই গোল হয়ে বসে শুনতাম। তখন এই ছিল অন্যতম বিনোদন।

তবে আমাদের সন্ধ্যাগুলো ছিল অন্যরকম। সন্ধ্যার পর পড়া লেখায় বসে থেকেও টের পেতাম আব্বার সাথে আমাদের ফার্মেসীতে বসতো বিবিসি বাংলা শোনার এক আসর। আব্বা ছিলেন (প্যারামেডিকেল) ডাক্তার। সেই স্থানীয় বাজারে থাকা আরেক ডাক্তার কাকু (ভানু বাবু বলতেন সবাই) রণজিৎ কাকা, অজিত কাকা, স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক খালেক স্যার, সালাম স্যার। কাছেই থাকা আমার বেশ কজন মামা, আবু মামা, লাল মামা এবং এর বাইরেও অনেক অল্প চেনা বেশী চেনা বা কোন কোন দিন অচেনা কারো যোগদান। বাসা থেকে চা-বিস্কুট ছাড়াও বাজারের স্টল থেকে আসতো মিষ্টি, সুমোচা, সিঙ্গারা বা পেঁয়াজু আর সাথে আড্ডা। পড়তে বসেও কান পেতে থাকতাম ওদিকে সেই গমগমে আড্ডা আওয়াজে। খবর শুনার পালা শেষে রেডিও চলে আসতো আম্মার দখলে। সন্ধ্যা রাতের অনুষ্ঠান শোনা শেষে সেই সময়ের সিনেমা দেখে এসেছে এমন কোন গল্প আমার আম্মা এবং মামাদের দুই একজন এত সুন্দর করে সেই গল্প বলা শুরু করতেন আমি সকলের অগোচরে যেয়ে পেছনে বসে যেতাম। শাবানা, রোজিনা বা ববিতার কোন কষ্ট চিত্র বর্ণনা করা হচ্ছে আমি শুনছি, শুনছি, হঠাৎ হয়তো হিচকি উঠিয়ে কান্না শুরু করে দিতাম নায়িকার কষ্টে। শুরুতেই আম্মার এই আড্ডায় এক অনাহুতের অনাকাঙ্ক্ষিত ছেদ তাই নিয়ে খানিক ভ্যাবাচ্যাকা। এরপর পড়া ছেড়ে উঠে কেন এলাম তাই নিয়ে একটা আইন ও সালিশীর পাঁয়তারা আমার বিরুদ্ধে!!

এইরকম প্রেক্ষাপটেই আব্বা ফার্মেসী থেকে এসে হাজির হতেন এবং রায় ঘোষণা আমার পক্ষেই যেত এবং পরবর্তীতে এই সব নিয়ে আমার দুই একজন মামা রসিকতা করতেও ছাড়তেননা। অভিনয় করে দেখাতেন। এই আমি পিতার অতি আদরের কন্যাটি নাকি 'আব্বা' ডাকতে যেয়ে কখনই সেটি স্বাভাবিক স্বরে বলতামনা। বদলে যেতে গলার স্বর, সুর এবং মুখের জ্যামিতি। যাই হোক সেই সময় মামারা যাই বলে থাকুক সাময়িক কৌতুক খাতিরে তবে এটা জানতাম আমার বাবা আমার সবচেয়ে বড় প্রশ্রয়ের এক নাম। কিশোরী নদীর।

আমার জন্মের প্রায় ৫ বছর পর ছোট ভাইয়ের জন্ম। ছোটবেলায় খাবার নিয়ে ভীষণ জ্বালানো বাচ্চারা যেমন হয় আমি ছিলাম তার এক জলন্ত উদাহরণ। শাক সবজি মাছ ভাত কিছুই প্রিয় না। প্রিয় শুধু সকাল বিকাল একটু দুধের সর, মলাই, কাপ ভর্তি। ছোট ভাইয়ের জন্মের পর আব্বার দুই একজন রসিক বন্ধু, যারা আমার কাকু, মামা, তাঁদের কেউ বোধ হয় শুরুতেই আমাকে ভয় দেখালো এখন আমার কী হবে, আর তো আদর করে দুধের সর খেতে দেবেনা। ভাই এসেছে ওই সব পাবে।

আমার ছোট পৃথিবী হঠাৎ মনে হল এতোটা নিষ্ঠুর। আজ যে এলো তার জন্যে আমার মা বাবা অন্য সবাই আমাকে আর আদর করবেনা। হায়। কোথায় যেন লুকিয়ে কান্না করতে চলে গেছি। দিন শেষে আব্বা ঠিক খুঁজে এনে সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন আমাকে এভাবে আর কেউ বলতে পারবেননা, কিছুতেই না। আহ শান্তি, বুঝলাম আব্বা আছে তো আমার পৃথিবী কেউ বদলে দিতে পারবেনা।

আমার আব্বা খুব চাইতেন আধুনিকতার রেশ যেন তাঁর পরিবার কিছুতেই মিস না করেন। গ্রামের বাজারে বসবাস

কিন্তু ঢাকা ময়মনসিংহ যেতেন ফার্মেসীর ঔষধ পত্র কিনতে এবং যতবার শহর থেকে ফিরতেন আমাদের জন্যে ব্যাগ থেকে বের হত, লাল টুকটুকে আপেল, টফি চকলেট, গল্পের বই এবং ইত্যাদি নানান নূতন কিছু না কিছু। আব্বা একবার এমন কিছু নিয়ে এলেন, যা আমরা এর আগে কখনই দেখিনি। ছোট রঙিন প্যাকেট, হলুদ মায়া মায়া মুরগীর বাচ্চা, ডিম এবং ধনে পাতার ছবি। ভেতর থেকে বের হল অন্য রকম এক সেমাই সদৃশ কিছু এবং ছোট আরো এক প্যাকেট তেল... সেই রাতেই স্টোভ জ্বালানো হল, আমরা অধীর আগ্রহে বসে আছি প্যাকেট দেখে দেখে আব্বার নির্দেশ অনুযায়ী রান্না হচ্ছে। বাটিতে নিয়ে খেলাম, আহ কী সেই স্বাদ, ভুলবার নয়। পরদিন পাড়ায় দুই একজন বলাবলিও করছে আমরা শহর থেকে আনা ঝাল ঝাল সেমাই খেয়েছি। (ও আচ্ছা যারা বুঝেননি তাদের বলি, ওটা ছিল জীবনের প্রথম আমাদের নুডুলস খাওয়া)।

মুক্তিযুদ্ধের ঠিক পরের বছরই আমার মা এস এস সি পাশ করেন এবং বিয়ের ঠিক পর পর। আম্মা পড়ালেখাটা চালিয়েছেন, শিক্ষকতার চাকরী নিয়ে অন্য শহরে গেছেন। পড়তে চান এবং শিল্প সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহের জন্যেই আব্বার উদ্যোগেই আম্মাকে ''বেগম'' পত্রিকার গ্রাহক করে দিলেন। সপ্তাহে একদিন ডাক যোগে পেতাম 'বেগম'। আব্বা শহরে গেলে আসতো বেশ কিছু সিনেমা পত্রিকাও আম্মার জন্যে। এই ধারাবাহিকতায় 'দেশ' 'সানন্দা' এবং আব্বা 'মাসিক মদিনা' এমন কিছুও পড়তেন বোধ হয়।

সাংস্কৃতিক একটা আবহ পেয়েছি বলেই, স্কুলের সকল রকম সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার জন্যে মা বাবার তাগিদ থাকতো ভীষণ রকম। নাচ, গান, খেলাধুলার সকল শাখা এবং বিশেষত কোন শিক্ষকের বিদায়ে মানপত্র পাঠ বা এলাকার কোন সম্মানিত মানুষকে গলায় মালা দেয়ার কাজটা কেন যেন আমাকেই করতে হত। ঠিক সেই সময়, একদিন বড় ভাই আপাদের স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান গাইলাম আমি, *"এ দেশ বাংলা, স্বাধীন বাংলা, রুপের পসরা এই বাংলা। খাল বিল নদী নালায় এ দেশ ভরা, বন মাঝে কুহু তান আকুল করা"!!* বোধ হয় ১৯৮৫/৮৬ সালের কথা, এটা আমার বাবার লেখা, আমার মা আর বাবা দুজন মিলে সুর দিয়েছিলেন! আমার বাবা, পরিপাটী থাকতেন, একটা সময় পর্যন্ত ফুটবল খেলেছেন। মাকে নিয়ে সিনেমা দেখতেন হল এ যেয়ে। ছোট বেলায় দেখেছি শীতের সময় ব্যাডমিন্টন খেলা হতে আমাদের বাসার পিছনের খোলা জায়গায়, মা খেলতেন, বাবা কখনও কখনও। ক্যারাম খেলা, লুডু দাবাও হতো প্রায়ই, আমার বাবা, উনার কিছু বন্ধু, আমার বেশ ক'জন মামা আর কাজিন ভাইবোনরা সেই খেলায় অংশ নিতো, আমি ও আমার ছোট ভাই বোনেরা দর্শক একটা সময় পর্যন্ত।

বাসায় রেডিও শোনা হতো খুব বলেছি, সাদা কালো টিভি কেনার আগ পর্যন্ত। খুব প্রাচুর্য ছিলোনা। ছিল চিত্তকে শান্তি দেয় এমন আয়োজন। মা-বাবাকে পেয়েছি খোলা মনের সংগীতপ্রিয় লেখালিখি ভালবাসে, বন্ধু আড্ডা পছন্দ করেন এমন আন্তরিক মানুষ হিসেবেই। একটা পারিবারিক ছবি শেয়ার করছি, শুধু সেই সময়ের আবহ বুঝানোর জন্যে। এবং এই পারিবারিক ছবিতে আছে মামা, কাজিন, মা বাবা এবং আমরা ভাই বোন সবাই। এবং এটি শহর থেকে অনুরোধ করে আনা হয়েছিল ঢাকায় থাকা এক ফটোগ্রাফার আত্মীয়কে।

ঈদে বা অন্য সব উৎসবে আব্বা সব সময়ই শহর থেকে কোন না জামা কিনে নিয়ে যেতেন এবং সেই সময় সেই গ্রামে সেই জামা পরে বের হলে বুঝতে পারতাম আমি কোন না কোন ভাবে একটু আলাদা কেউ। বাবা মায়ের মনোযোগ পাওয়া আদরীনি কন্যা।
সেই কিশোরী কন্যা, হোগলা গ্রাম ছেড়ে, শহরের স্কুল, হোস্টেল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে পা রাখার সৌভাগ্য অর্জন করেছে এমন একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নিয়েই শুধু তাঁদের উৎসাহের জন্যেই। যদিও স্কুল কলেজ পাশ করার পর শুরুতে ভর্তি হয়েছিলাম ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে অর্থনীতি বিষয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ এলো, কেন যেন শুরুতে বাবা চাইলেননা ঢাকা পাঠাতে। সেই একবারই বাবার একটু অনিচ্ছা, না কোনদিন জিজ্ঞেস করা হয়নি সেটা কী শুধু বাবার কাছে রেখে দেবার জন্যেই আরো কিছু দিন?! না অন্য কিছু, এটা ঠিক বাংলাদেশে নানান কারণে, হয়তো মেয়েরা বিয়ে করে একদমই অন্য পরিবারের 'কেউ' হয়ে যায় বলেই একটা সময় পর্যন্ত পরিবারে কেউ কেউ মধ্যমণি হয়েই বেড়ে উঠে এবং বিশেষ করে 'বাবার আদরের মেয়ে' এই রকম একটা বিষয় অনেক মেয়েদের জীবনেই কাঙ্ক্ষিত একটা অধ্যায় হয়েই থাকে। আমি এমন এক মেয়ে... একটা সময় পর্যন্ত মা বাবা পরিবারের বিশেষ ভালোবাসা পেয়েছি এবং জীবনের এ বেলায় এসে ভীষণ করে বুঝতে পারি, কী ভীষণ 'বেসড আমি'।

আজকের সামাজিক, পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে যখন দেখাচ্ছে মেয়েদের বেড়ে উঠার সাথে কতকিছুই না সম্পর্কিত, বাধ্যতামূলক, পরিবার, সমাজ চাপিয়ে দিচ্ছে... আর সেই সময়ে আমার মা-বাবা আমাকে, নিজের মত করে ভাবনার একটা জগত গড়তে দিয়েছেন, শিল্প সংস্কৃতির প্রথম পাঠটা দিয়েছেন। যা আমাকে জীবনের এ বেলায় এসেও নানান ভাবে শিখিয়ে দেয় বৈরী সকল আবহাওয়া মোকাবেলার শক্তি হিসেবেই।

আমি কিছু সময় প্রকৃতির মাঝে হারাতে হারাতে বুঝতে শিখেছি, জীবনের আঁকে বাঁকে ছড়িয়ে আছে অনেক অনেক আলো। আমাকে সেই আলোর পথেই হাঁটতে হবে... থোকা থোকা জোনাক পোকা, ছোট্ট ঘাস ফুলকে আঁকড়ে ধরেই বলতে চেয়েছি জীবন সুন্দর। এই এই বোধের জন্যে আমার কৈশোরের কাছে ঋণী এবং ঋণী আমার মা বাবার কাছে। আমার বাবা মানুষ হিসেবে তাঁর আলাদা করে হয়তো অনেক ব্যার্থতা আছে, সীমাবদ্ধতা আছে... কিন্তু একজন বাবা হিসেবে চেষ্টা করেছেন তাঁর প্রতিটি বাচ্চাকে সেরাটুকু দিতে... আমার বাবা (আমরা আব্বা বলি) আমাদের ভাই বোনদের ওভাবে শাসন করা বা বকা দিতেননা। মজার ব্যাপার হচ্ছে সবাইকে তাঁর জীবনে ২/৩দিন বারই কেবল কঠিন শাসন করেছেন যা সারা জীবন মনে রাখার মত। আমাকেও তাই... আমাকে আব্বার প্রথম দেয়া বকা... 'হুতুম প্যাঁচার দল" ভাবা যায়!!

বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ি দেয়ার পরই আমার পরিবারের সাথে একটু দূরত্ব। ছুটিতে অল্প সময়ের জন্যেই বাড়ি ফেরা, খুব আদর আদর কিছু সময় নিয়ে আবার ফেরার তাড়া। পড়ালেখা শেষ হতে না হতেই বিয়ে চাকরী মা হওয়া এবং আমার কাজ পাগল মা বাবা সব সময় যা চাইতেন আমরা যেন কাজের মাঝেই থাকি। যদিও বড় একটা আফসোস মা বাবা বোধ আমাকে অন্যরকম একটা পেশায় বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন বা খুশী হতেন সেটি পারিনি। পরবাসে চলে এলাম। দূরত্ব শুধু হাজার মাইল না যেন অন্য কোন খানেও ক্রমশই বাড়ছিল একটু একটু করে। বদলে যাওয়া বাংলাদেশের অনেক অনেক পরিবারের মতোই আমার পরিবারে থাকা অন্যদের উপরও ছিল তার প্রভাব।

দেশে গেছি গত প্রায় ১১ বছরে মাত্র ৩ বার। ২০১৬ এবং ২০১৯ এ মনে হল, আমার সেই বাবা, এই বয়েসে এসে কেমন যেনো নির্জীব হয়ে গেছেন, শারীরিক ভাবে অল্প কিছু সমস্যা থাকলেও, মনের দিক থেকে কেন যেন আমাদের দেখা সেই শৈশব কৈশোরের বাবাকে পাচ্ছিনা। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফোনে কথা বললেই নিজের বুকের মাঝে শ্বাস কমতে থাকে যেন আমার। কান্না পেত প্রায়ই। আমি কী করতে পারি, কী করা উচিৎ এই নিয়ে ভাবতাম চাইতাম আব্বাকে উৎজীবিত করতে, হতেনও সাময়িক। সকলকে বলতেন তিনি একজন সুখী মানুষ। তৃপ্ত তাঁর ছেলে মেয়েকে নিয়ে, কোন অভিযোগ নেই জীবন নিয়ে!! নিজেকে অপরাধী লাগতো আমার, তারপরও, যে মা-বাবার কাছ থেকে 'জীবনকে ভালোবাসতে শিখলাম' জগতকে অন্তর চক্ষু দিয়ে ছুঁতে শিখলাম সেই বাবাকে এমন দেখতে যে কি অসহায় লাগতো মাঝে মাঝে, বলে বুঝাতে পারবোনা। কেন উনার পাশে থেকেই গেলামনা বাকিটা জীবন।

মা-বাবারা সুস্থ থাকবে, সুন্দর করে ভাববে (অবশ্যই কোন ভাবেই মৃত্যু চিন্তা নয় শুধু), ভালো বই পড়বে, সময় করে বন্ধুদের সাথে কথা বলবে, যে বন্ধুরা জীবনের কথা বলে, ভালো গান শুনবে, পৃথিবীর সেরা গল্প কবিতা সুন্দর জায়গা'র কথা জানবে শুনবে, ঘাস, ফুল, প্রজাপতির সাথে কাটাবে কিছু না কিছু সময়, সবুজে হাঁটবে এবং ভালোবাসবে, এমন সব সময় হয়না কেন বাংলাদেশের সব মা-বাবার জন্যে! এমন ভাবনাগুলোও গত দুই চার বছর ধরে ক্রমাগত ভুগাচ্ছিলো আমায়।

চোখের সামনে মা-বাবাদের ভিতর এবং বাহির খুব বেশীই বদলে যাচ্ছে কি, বাংলাদেশে!! আমি এমন এক বাবাকে দেখেছি যিনি তারুণ্যে ''গীতাঞ্জলী'' পড়তেন নিজে গুন গুন গাইতেন সেই বাবা নিজের আত্মীয় মেয়েকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ এসেছে শুনে মানা তো করলেনই, চারুকলায় পড়বেন শুনে বলেই দিলেন এই মেয়ে ওখানকার বারান্দায় বসে গাঁজা টানা ছাড়া কিছুই করবেনা! ক্লাস সেভেনে পড়ার সময়ই সিদ্ধান্ত হলো, ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেটে ভর্তি পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি নিতে হবে আমাকে। মা বাবা এবং স্কুল শিক্ষকদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল আমাকে দিয়ে হবে... অতিরিক্ত চাপেই হোক বা মনের গহীনে অন্য ইচ্ছার জন্যেই হোক, সেইরকম অসুস্থ হয়ে গেলাম মূল পরীক্ষার আগে। টাইফয়েড বাঁধিয়ে সব দিলাম ছ্যাড়াবেরা করে। ভর্তি পরীক্ষা খারাপ হলোনা। কিন্তু হাইট, বাড টেস্ট কী কী যেন জটিলতায় হলোনা চান্স। গ্রাম থেকে শহরে পড়বো বলে বের যখন হলামই, আম্মা আব্বা আর কিছুতেই গ্রামে ফেরত নিয়ে গেলেন না আমায়। ময়মনসিংহ শহরের আরেক নাম করা স্কুল, বিদ্যাময়ী, সেখানে চান্স হলেও হোস্টেলে সিট নেই... ফলাফল মুসলিম গার্লস স্কুল হোস্টেলে একদম সরাসরি ঢোকা। নাটক সিনেমার মতোই আম্মা আব্বা ময়মনসিংহ শহরের মার্কেট ঘুরে দুইটা ব্যাগ সুটকেস গুছিয়ে দিয়ে তাঁরা ফিরে গেলেন প্রথম দিন হোস্টেলে আমাকে রেখে... তখন নিয়ম ছিল সপ্তাহে একদিন এসে ঘন্টা খানিকের জন্যে দেখা করতে পারবেন শুধু পরিবারের সদস্য। সে এক কঠিন জীবন... বাবা-মা অশ্রুসজল চোখে বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন।

সম্ভবত সে রাতেই অল্প কজন মেয়ে যে যার বিছানায় ঘুমাচ্ছি। আধো ঘুম জাগরণে দেখি বাতাসের ঝাঁপটায় কাঠের জানালার পালা খুলে সপাটে ওয়ালে আঘাত হানছে, বন্ধ হয় খুলে... বিদ্যুৎ চলে গেছে, ঠিক জানালার ওপাশেই কাঁঠাল গাছ বোধ হয় পাতাগুলো বাতাসে সব উল্টো হয়ে বিদ্যুৎ চমকের তোড়ে অদ্ভুত রং ধারণ করে দৃশ্যমান হচ্ছে... পরিবার ছেড়ে আসার কষ্ট, মাঝ রাত, অচেনা এমন একটা আবহ, সবমিলে মনে হচ্ছে আমি অপার্থিব এক পৃথিবীতে চলে গেছি। হোস্টেলে তখন অল্প কিছু মেয়ে। সবচেয়ে ছোট যে মেয়েটা ওর নাম 'টিউলিপ' ও একটু দুরেই ঘুমুচ্ছিলো, হঠাৎ জেগে উঠে পাখির মত ছুটে এসে আমার কাছে এসে জড়িয়ে ধরে বসে কাঁদছে... সে এক স্মরণীয় রাত!! পরের ছুটিতে বাসায় গেছি, গল্পে গল্পে উঠে এল, সেই ঝড়ের রাতে বাসায় ফিরে আব্বা, আমার জন্যে অনেক কাঁদছিলেন। আমার এই ছবিটা দেয়ালে ছিল তখন, ছবিটা দেখতেন প্রায়ই, কোন একদিন নাকি বলছিলেনও আমার মেয়ের চোখ... আমার মা, অনেক মায়া... বলছিলেন নাকি, এই ছবিটা দেখে এমন, আমার আব্বা!

আজ আমি আমার বাবার ছবি দেখি আর বলছি, কী মায়া বাবার চোখে... বাবা দেখতে পারছেন না আমার চোখ আজ, পারছেন কী! ২০২০ এর ২৫ সেপ্টেম্বর কোভিডের সেই অন্ধকার সময়ে আমার বাবা চলে গেছেন না ফেরার দেশে, আমার আব্বা এই পৃথিবীর আর কোথাও কোনদিন তাঁকে খুঁজে পাবোনা, হারিয়ে ফেলেছি।

আজমুল হক পাপ্পু'র

মাটি দেওয়া হয়নি যে কবরে

আমরা ছিলাম ছয় ভাইবোন। চার ভাই, দুই বোন। আমি সবার ছোট। বাবা কোনোদিন আমাদের গায়ে হাত তোলেননি, একটা থাপ্পড়ও না। অথচ আমরা সবাই তাকে ভীষণ ভয় পেতাম। এই ভয়ের নাম বোধহয় সম্মান। আমাদের বাড়িতে তিনটা গেট ছিল। প্রথমে লোহার গেট, তারপর দুই পালার কাঠের দরজা, শেষে ঘরে ঢোকার দরজা। বাবা যখন বাইরে থেকে ফিরতেন, লোহার গেটটা ধাক্কা দিয়ে একটা শব্দ করতেন ঠিক যেন সংকেত। আমরা তখন যে যা করছি, টিভি ফেলে, খেলা ফেলে, দৌড়ে গিয়ে পড়ার টেবিলে বসে পড়তাম। ওই শব্দটা এখনো কানে বাজে।

মাগরিবের পর বাইরে থাকার নিয়ম ছিল না আমাদের। ব্যতিক্রম ছিল শুধু একটা রাত যে রাতে মসজিদে সারারাত এবাদতের অনুষ্ঠান হতো। ওই একটা রাতেই বাবা বাইরে থাকার অনুমতি দিতেন। ছোট্ট একটা নামাজ শেষ করেই আমরা বন্ধুরা মিলে গল্প, খেলা, আড্ডায় মেতে উঠতাম। মনে হতো যেন বছরের সবচেয়ে স্বাধীন রাত।

বাবা একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। একা হাতে ছয়টা সন্তানকে মানুষ করেছেন, আমরা সবাই আজ যার যার জায়গায় ভালো করছি। বাবা-মা যেন গুড কপ-ব্যাড কপ খেলতেন। বাবা ছিলেন ব্যাড কপ। তাই কোনোদিন সাহস করে বাবাকে বলতে পারিনি বাবা, তোমাকে আমি অনেক ভালোবাসি।

বাবাকে কোনোদিন কাঁদতে দেখিনি। একবারও না। যেদিন প্রথম অস্ট্রেলিয়া আসার জন্য বাড়ি থেকে বের হই, বাবা আমাকে বিদায় জানালেন। অনেক অনুপ্রেরণার কথা বললেন। আমি গাড়িতে উঠলাম, গাড়ি ছাড়ল। কয়েক সেকেন্ড পর পেছন ফিরে তাকালাম, দেখি বাবা চোখ মুছছেন। সেই প্রথম, এবং সম্ভবত একমাত্র বার, আমি বাবাকে কাঁদতে দেখেছিলাম। এতগুলো বছরের কঠোর মানুষটা, যার একটা ধমকে আমরা বই খুলে বসে যেতাম, তিনিও যে ভেতরে ভেতরে এতটা কোমল ছিলেন তা বুঝেছিলাম শুধু ওই একটা মুহূর্তে।

তারপর একদিন খবর এল, বাবার লিভার ক্যান্সার ধরা পড়েছে। চিকিৎসার জন্য আম্মা, ভাই আর চাচা তাকে নিয়ে গেলেন ইন্ডিয়া। আমিও অস্ট্রেলিয়া থেকে রওনা দিলাম। চিকিৎসার প্রথম ধাপ শেষে বাবা বাংলাদেশে ফিরে এলেন, আমি এয়ারপোর্ট থেকে তাকে নিয়ে এলাম বড় বোনের বাসায়, মহাখালীতে। এখনো চোখে ভাসে বাবা হেঁটে হেঁটে বেরিয়ে আসছেন এয়ারপোর্ট থেকে, দেখে মনেই হয়নি তিনি এত অসুস্থ।

> বাবা, তুমি হয়তো কোনোদিন মুখ ফুটে বলোনি ভালোবাসার কথা, আমিও বলার সাহস পাইনি তোমাকে। কিন্তু আজ বুঝি, ভালোবাসা সবসময় শব্দে বাঁধা থাকে না। তোমার লোহার গেটের ওই একটা শব্দ, মাগরিবের পর বাড়ি ফেরার কড়া নিয়ম, বিদায়বেলার লুকিয়ে রাখা চোখের জল, আর জীবনের শেষ মুহূর্তে বলা ওই একটা ডাক "তাড়াতাড়ি চলে আসো" এসবই ছিল তোমার ভাষা। তুমি বলে গেছ সব, শুধু অন্যভাবে।

কিছুদিন পর সিডনি ফিরে গেলাম। মাস কয়েক পর বাবার অবস্থা খারাপ হতে শুরু করল। আমার সাথে বাবার শেষ যে কথাগুলো হয়েছিল, তা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। কোনো দ্বিধা ছাড়াই বাবা বললেন "তাড়াতাড়ি দেশে চলে আসো।" কথাগুলো এত স্পষ্ট, এত দৃঢ় ছিল যে আমি কল্পনাও করতে পারিনি এর মানে কী। সেদিন ছিল উইকএন্ড। ভাবলাম সোমবারে টিকেটের খোঁজ নেব। ঐদিন রাতেই আমার এক ফ্লাট মেট ছোট ভাই বলল "ভাইয়া, আপনার মনে হয় দেশে যাওয়া উচিত।" আমি কিছু না ভেবেই সকালে সোজা এয়ারপোর্টে চলে গেলাম। কেন জানি সেদিন কান্না থামিয়ে রাখতে পারছিলাম না। কাউন্টারে গিয়ে শুনলাম টিকেট নেই। একটু দূরে দাঁড়িয়ে চোখ দিয়ে অবিরাম পানি পড়ছিল। আধা ঘণ্টা পর ডাক এল,

একটা টিকেট ম্যানেজ করা গেছে। সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সে রওনা দিলাম। কল্পনাও করতে পারিনি বাবা মারা গেছেন কিন্তু প্লেনে বসে কান্না থামাতে পারছিলাম না।

সিঙ্গাপুর গিয়ে বাসায় ফোন দিলাম, বললাম দেশে আসছি। আমার কষ্ট হবে ভেবে পরিবারের কেউ আমাকে বাবার মৃত্যুর কথা বলল না। এয়ারপোর্ট থেকে দুই বন্ধু আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখি ওরা আমাকে গোরস্থানে নিয়ে যাচ্ছে। আমি আসার খবর পাওয়ার আগেই, মাগরিবের পর, বাবাকে কবর দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। আমিও সেদিনই বাংলাদেশে পৌঁছেছিলাম রাত ১১ টাই, কিন্তু বাবার কবরে মাটি দিতে পারিনি।

এই কষ্টটা আজও আমাকে বয়ে বেড়ায়। যখনই অন্য যে কোনো কারণে কষ্ট পাই, বাবার কবরে মাটি দিতে না পারার কথাটা মনে চলে আসে।

বিদেশে থাকা মানুষদের একটা আলাদা যন্ত্রণা থাকে, যা দেশে থাকা মানুষ কোনোদিন বুঝবে না। প্রতিটা মিসড কল, প্রতিটা রাতের অচেনা নম্বর, বুকের ভেতর একটা ছোট্ট কম্পন তুলে দেয়। ফোনটা হাতে নেওয়ার আগের ওই কয়েক সেকেন্ড মনে মনে হাজারটা দোয়া পড়ে ফেলি। দূরে থেকে ভালোবাসা যায়, কিন্তু পাশে থেকে ভালোবাসা যায় না। আপনজনের অসুস্থতার খবর শুনেও ছুটে যাওয়া যায় না সাথে সাথে, একটা ফ্লাইটের অপেক্ষা করতে হয়, আর সেই অপেক্ষার মধ্যেই কখনো কখনো সময় ফুরিয়ে যায়। এই ভয়টা, এই অপরাধবোধটা, প্রবাসে থাকা প্রতিটা মানুষ নিঃশব্দে বয়ে বেড়ায় দেশের প্রিয়জনদের কাছ থেকে অনেক দূরে থেকেও তাদের নিয়ে দুশ্চিন্তা কখনো কমে না।

বাবা, তুমি হয়তো কোনোদিন মুখ ফুটে বলোনি ভালোবাসার কথা, আমিও বলার সাহস পাইনি তোমাকে। কিন্তু আজ বুঝি, ভালোবাসা সবসময় শব্দে বাঁধা থাকে না। তোমার লোহার গেটের ওই একটা শব্দ, মাগরিবের পর বাড়ি ফেরার কড়া নিয়ম, বিদায়বেলার লুকিয়ে রাখা চোখের জল, আর জীবনের শেষ মুহূর্তে বলা ওই একটা ডাক "তাড়াতাড়ি চলে আসো" এসবই ছিল তোমার ভাষা। তুমি বলে গেছ সব, শুধু অন্যভাবে।

আমি শুধু তোমার কবরে এক মুঠো মাটি দিতে পারিনি, বাবা। এই একটা অপূর্ণতা আজীবন বয়ে বেড়াব। কিন্তু বাকি সবকিছুতে আমি তোমার কাছে ঋণী তোমার নীরব শাসনে, তোমার নিঃশব্দ ত্যাগে, তোমার কঠিন হাতের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কোমল একটা মনে।

আজ আমি নিজেও দুই মেয়ের বাবা। তুমি যা বলতে পারোনি, আমি তা প্রতিদিন বলি। যখনই সুযোগ পাই, মেয়েদের বুকে জড়িয়ে বলি "মা রে, তোদের আমি অনেক ভালোবাসি।" ওরাও বলে, "আমরাও তোমাকে অনেক ভালোবাসি, বাবা।" এই কথাগুলো বলার মধ্য দিয়ে হয়তো আমি তোমাকেই একটু একটু করে ফিরে পাই, বাবা। তোমার কাছ

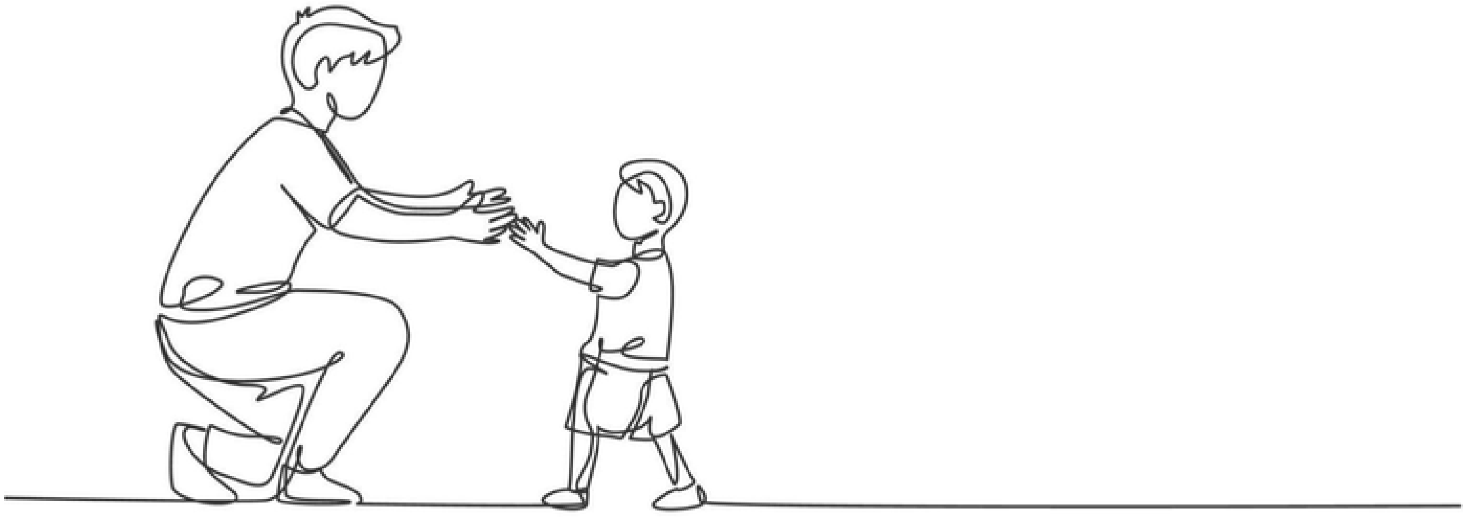

অয়ন ইসলাম এর

জননী দাতব্য চিকিৎসালয়

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আব্বুকে আমি রোগীদের ভিড়ের ভেতরেই দেখে এসেছি। মানুষের ভিড়, তাদের আকুলতা, ওষুধটা হাতে পাওয়ার পর মুখে ফুটে ওঠা স্বস্তি - ছোটবেলায় এসবের মানে বুঝতাম না। যত বড় হয়েছি, একটু একটু করে বুঝেছি। কিন্তু সত্যিই কতটুকুই বা বুঝেছি!

আব্বু চলে গেছেন ২০১৮ সালের ২ মার্চ, চুরাশি বছর বয়সে। আট বছর পেরিয়ে গেছে, এখনো এই মানুষটাকে আমি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি। একজন মানুষের ভেতরে কতখানি দরদ আর তাগিদ থাকলে চুরাশি বছর বয়সেও দিনের বড় একটা সময় অন্য মানুষের উপকারে কাটিয়ে দিতে পারেন, সেই হিসাবটা আমি আজও মেলাতে পারি না। তাঁকে নিয়ে লিখতে বসে দু'বার থামতে হয়েছে। কেন থেমেছি, সেটা ব্যাখ্যা করতে চাই না। তাই সেই সময়ের আব্বুকে শুধু নিজের স্মৃতি থেকে না এঁকে, অন্য একজনের দেখা আব্বুকে খানিকটা তুলে দিই। প্রথম আলোর শনিবারের ক্রোড়পত্র 'ছুটির দিনে'-তে আব্বুকে নিয়ে একটা লেখা ছাপা হয়েছিল। লেখাটা যখন ছাপা হচ্ছে, আব্বু তখন বেঁচে আছেন, রোজ বিকেলে কাদিরগঞ্জের দাতব্য চিকিৎসালয়ে গিয়ে বসছেন। ষোলো বছর আগের ওই লেখার প্রতিটা বাক্য বর্তমান কালে বলা, পড়তে গেলে মনে হয় তিনি এখনো ওখানেই বসে আছেন।

"রাজশাহী শহরের রেলগেট এলাকায় হঠাৎ একজন রিকশাচালক পড়ে গিয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেলেন। পাশেই শ্রমিক ইউনিয়নের ছোট্ট একটা ঘরে ছিল 'জননী দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়'। চিকিৎসক গোলাম মোস্তফা ছুটে এলেন রিকশাচালকের কাছে। লক্ষণ দেখে ওষুধ খাইয়ে দিলেন। সঙ্গে আরও কিছু ওষুধ দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। সাত দিন পর রিকশাচালক নিজেই রিকশা চালিয়ে দেখা করতে এলেন। ওষুধের দাম দেবেন। কিন্তু চিকিৎসক গোলাম মোস্তফা কিছুতেই টাকা নেবেন না। তিনি শুধু তাঁর মায়ের জন্য দোয়া চাইলেন। রিকশাচালক প্রাণভরে দোয়া করলেন, 'আল্লাহ আপনার মাকে জান্নাতবাসী করুক।' এভাবে মায়ের আদেশে গোলাম মোস্তফা কলকাতা ন্যাশনাল হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসে ৫৩ বছর ধরে দুস্থ মানুষকে চিকিৎসাসেবা দিয়ে যাচ্ছেন। মূলত দুস্থদের চিকিৎসক হলেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সমাজের কিছু বিত্তশালী মানুষও তাঁর কাছ থেকে চিকিৎসাসেবা নেন।

গোলাম মোস্তফার জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘি থানার শীতলপাড়া গ্রামে। ১৯৪১ সালে তাঁর বাবা সানোয়ার আলী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। টানা তিন দিন রোগযন্ত্রণায় ছটফট করে তিনি মারা গেলেন, কিন্তু তাঁর জন্য কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়নি। আশপাশের কয়েক গ্রামে কোনো চিকিৎসক ছিল না। শোকাহত মা আমেনা খাতুন সেদিনই ছেলের হাতে হাত রেখে একটা প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন যে ছেলে চিকিৎসক হয়ে গ্রামের দুস্থ মানুষের সেবা করবে। গোলাম মোস্তফা মায়ের কাছে করা সেই প্রতিজ্ঞা ভোলেননি।

> "১৯৪১ সালে নিজের বাবাকে বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে দেখে যে ছেলেটির হাত ধরে তার মা একটা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন, সাতাত্তর বছর পর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সেই ছেলেটি প্রতিজ্ঞাটা রেখে গেছে।"

কলকাতা ন্যাশনাল হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ থেকে তিনি এইচএমবি ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর থেকেই তিনি শেখদিঘি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে চাকরি করার পাশাপাশি মায়ের নির্দেশে চিকিৎসাসেবা দেওয়া শুরু করেন। তখনো ঐ অঞ্চলে চিকিৎসক নেই। সকালে তাঁর বিদ্যালয়েই মানুষ ওষুধের জন্য ভিড় করতে লাগল। বাধ্য হয়ে ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে তিনি বিদ্যালয়েই চিকিৎসা শুরু করেন। বাড়ি ফিরে আবার অনেক রাত পর্যন্ত চলত তাঁর এই দাতব্য চিকিৎসা। এভাবে তিনি প্রতিদিন ৪০০-৫০০ রোগীর চিকিৎসা

দিতেন। তাঁর মা মারা যাওয়ার আগেই ছেলের চিকিৎসার এই দৃশ্য দেখে গেছেন।

পরবর্তীতে তিনি রাজশাহীতে বসবাস শুরু করেন। প্রথমে রেলগেটে, পরে কাদিরগঞ্জে ঘর ভাড়া নিয়ে তাঁর চিকিৎসাসেবা চলছে। এখানেও প্রতিদিন দেড় থেকে দুইশ রোগীর চিকিৎসা দেন তিনি। প্রতিদিন বিকেলে তাঁর ওষুধের দোকানে রোগীর ভিড় লেগেই থাকে। দীর্ঘদিন ধরে এই কাজ করার কারণে রাজশাহী শহরের স্বল্প আয়ের মানুষ ও শ্রমজীবীদের পরিবারের চিকিৎসক হয়ে উঠেছেন তিনি।
তাঁর দোকানে গিয়ে কিছুক্ষণ বসলেই দেখা যাবে, দলে দলে মানুষ আসছে। ধারাবাহিকভাবে তাঁর পাশের চেয়ারে গিয়ে বসছে, রোগের বিবরণ দিচ্ছে আর ওষুধ নিয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ টাকার কোনো প্রসঙ্গই তুলছে না। গত মঙ্গলবার বিকেলে গিয়ে এ দৃশ্য দেখে বোঝা গেল, যে রোগীরা দোকানে ভিড় করছে, এরা সবাই তাঁর নিয়মিত রোগী। কারও অসুখ-বিসুখ হলেই ছুটে আসে চিকিৎসক গোলাম মোস্তফার কাছে। এদের মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যাই বেশি।

উপশহর নিউমার্কেট এলাকার রিকশাচালকের স্ত্রী রেণু বেগম (৪০) ওষুধ নিয়ে যাচ্ছিলেন। কত দিন ধরে এখান থেকে ওষুধ নেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, অনেক দিন ধরেই পরিবারের যার যখন সমস্যা হয়, তখনই এখানে ওষুধ নিতে আসেন। নগরের কাদিরগঞ্জ এলাকার রিকশাচালকের স্ত্রী শরীফা খাতুন (৩৫) নিজের কোমরের ব্যথার জন্য ওষুধ নিতে এসেছেন। সঙ্গে ছয় বছরের মেয়ে হাফিজার সর্দি-জ্বরের জন্যও ওষুধ নিচ্ছেন। শরীফা জানালেন, তাঁর পরিবারের চিকিৎসক হচ্ছেন এই গোলাম মোস্তফা।

ভিড় শেষ হলেও এক ভদ্রলোক পাশের টুলে বসে আছেন ওষুধ নেওয়ার জন্য। তিনি বাংলাদেশ বেতারের সাবেক আঞ্চলিক পরিচালক। নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তিনিও ওষুধ নেওয়ার জন্য বসে আছেন। তিনি জানান, শারীরিক কোনো সমস্যায় প্রথমেই তিনি গোলাম মোস্তফার কাছে আসেন। তিনি জানান, গোলাম মোস্তফা যাদের চিকিৎসা দিয়ে থাকেন, তাদের সিংহভাগই দুস্থ মানুষ। তবে তাঁর মতো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও এখান থেকে চিকিৎসা নিয়ে থাকেন।”

(ছুটির দিনে, ৮ মে ২০১০, ২৫ বৈশাখ ১৪১৭, পৃষ্ঠা ২১)

লেখাটা ছাপা হওয়ার পর আব্বু আরও প্রায় আট বছর বেঁচে ছিলেন, আর ওই আট বছরে দৃশ্যটা একটুও বদলায়নি। একই দাতব্য চিকিৎসালয়, একই চেয়ারে বসা মানুষটি, রোগীদের একই রকম ভিড়। শরীর ধীরে ধীরে ভেঙে আসছিল, তবু প্রতিদিন বিকেল হলে তিনি বেরিয়ে যেতেন। হেঁটে যাওয়া-আসা করতে কষ্ট হচ্ছিল, একটা নিয়মিত রিকশা ঠিক করে দিয়েছিলাম। কোনোদিন রিকশাটা নিতেন, কোনোদিন নিতেন না। বলতেন হাঁটলে আমার শরীর ভালো থাকবে। কিন্তু জননী দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়ে যাওয়া আর রোগী দেখায় ভাটা পড়েনি।

মা মারা যাওয়ার পরে, আমি দেশের বাইরে চলে আসার পরে তিনি যেন আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরেছিলেন সেটাকে। নিয়মিত ফোনে কথা হতো। কেমন আছেন জিজ্ঞেস করলে সবসময় বলতেন, ভালো আছি। আমার ভাগ্নে প্রায় প্রতিদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করত, কী দরকার আমাকে জানাত, আর আমি সেগুলোর ব্যবস্থা করে দিতাম। আব্বু নিজে কোনোদিন মুখ ফুটে বলতেন না তাঁর কিছু লাগবে কি না। আমাকে অন্যদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে বুঝতে হতো, তারপর জোর করে সেটার ব্যবস্থা করতে হতো।

প্রথম আলোর লেখাটায় একটা তথ্য আছে যেটার সত্যিকারের অর্থ বড় হয়ে বুঝতে শিখেছি। রেলগেটের ওই ছোট্ট ঘরটার নাম ছিল ‘জননী দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়’। যে রিকশাচালক সাত দিন পর নিজে রিকশা চালিয়ে টাকা দিতে এসেছিলেন, আব্বু তাঁর কাছ থেকে টাকা নেননি, চেয়েছিলেন শুধু তাঁর মায়ের জন্য দোয়া। ১৯৪১ সালে নিজের বাবাকে বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে দেখে যে ছেলেটির হাত ধরে তার মা একটা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন, সাতাত্তর

বছর পর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সেই ছেলেটি প্রতিজ্ঞাটা রেখে গেছে। ইত্তেফাক পত্রিকার সাংবাদিককে আব্বু বলেছিলেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই কাজ চালিয়ে যেতে চান। সেটাই করেছিলেন।

আব্বু চলে যাওয়ার পর প্রথম আলোর লেখাটার কথা মাঝে মাঝেই মনে পড়ে, তবে অন্য একটা কারণে। রেণু বেগম, শরীফা খাতুন, শরীফার ছয় বছরের মেয়ে হাফিজা - নামগুলো একটা পত্রিকার পাতায় থেকে গেছে, কিন্তু মানুষগুলো তো কোথাও না কোথাও আছে। হাফিজার এখন বাইশ-তেইশ বছর বয়স, হয়তো নিজেরই সংসার হয়েছে। শরীফা খাতুনের কোমরের ব্যথা কমেছে কি না আমি জানি না। না কমে থাকলে তিনি এখন কার কাছে যান, সেটাও জানি না। রাজশাহী শহরের কয়েক হাজার মানুষের কাছে 'ডাক্তার' শব্দটার মানে ছিল একজন নির্দিষ্ট মানুষ, একটা নির্দিষ্ট চেয়ার, বিকেলবেলার একটা নির্দিষ্ট ঘর। ২ মার্চ ২০১৮-এর পর ওই চেয়ারটা শূন্য পড়ে আছে। দাতব্য চিকিৎসালয়টার জায়গায় এখন কী আছে? হয়তো বহুতল ভবন উঠেছে সেখানে, কিংবা হয়তো কোনো একটা মোবাইল ফোনের দোকান বসেছে। আমি জানি না, জানতে চাইও না। আমার স্মৃতিতে রাজশাহী শহরের ওই জায়গাটা আজীবন জননী দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয় হয়েই থাকুক।

আমার কাছে মনে হয়, পৃথিবীতে যতদিন আছি, প্রতিটি দিনই বাবা দিবস, প্রতিটি দিনই মা দিবস। যাঁদের কারণে আমার এই পৃথিবীতে আসা, যাঁদের ত্যাগ, শ্রম আর মমতার মধ্যে দিয়ে আমার বড় হয়ে ওঠা, তাঁদের উপস্থিতি কিংবা তাঁদের স্মৃতি ক্যালেন্ডারের একটি তারিখে এসে শুরু বা শেষ হয় না। তাঁদেরকে আমি প্রতিদিনই স্মরণ করি। এ ছাড়া আর একটা কাজ করতে পারি - নিজের মতো করে, ভালোভাবে বাঁচতে পারি। আব্বু বেঁচে থাকলে ওটাতেই সবচেয়ে খুশি হতেন, তাই ওটাই আমার তরফ থেকে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানোর সবচেয়ে ভালো উপায়।

অর্ধশতাব্দী ধরে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন রাজশাহীর গোলাম মোস্তফা

রাবি সংবাদদাতা

মায়ের আদেশ ছিল রোগীজনের চিকিৎসা করে কোন অর্থ নেওয়া যাবে না। ডাক্তারি পড়া শেষ করে মায়ের সেই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে পালন করে চলেছেন তিনি। নীরবে নিভৃতে তিনি প্রতিদিনই গড়ে দেড়-দুইশ' রোগীকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দিয়ে চলেছেন। মাতৃভক্তির কঠিন দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী মানবসেবায় নিবেদিত প্রাণ এ ব্যক্তিটি হলেন রাজশাহীর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক গোলাম মোস্তফা (৮০)। নগরীর কাদিরগঞ্জ এলাকার সাফাওয়াং চাইনিজ রেস্টুরেন্টের পাশে 'জননী

ডা. গোলাম মোস্তফা

দাতব্য চিকিৎসালয়'-এর মাধ্যমে তিনি তাঁর বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, হোমিও চিকিৎসক গোলাম মোস্তফা প্রতিদিন গড়ে দেড় থেকে দুইশ' রোগী দেখেন। এসব রোগীদের বেশিরভাগই দরিদ্র ও শ্রমজীবী শ্রেণীর। তবে অনেক ধনী ও আর্থিকভাবে সচ্ছল- রোগীও আসেন তাঁর কাছে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা নিতে। মাসে ওষুধপত্র ও আনুষঙ্গিক খরচ প্রায় ১২ হাজার টাকা আর দোকান ভাড়া বাবদ ব্যয় হয় দেড় হাজার টাকা। এর সঙ্গে বিদ্যুৎ বিলও প্রতি মাসে গড়ে দুইশ' টাকার মত পরিশোধ করতে হয়। গোলাম মোস্তফা জানালেন, প্রতি বছর তিনি একবার করে ভারতের কোলকাতায় যান এবং সেখান থেকে এক বছরের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র কিনে আনেন।

কথা প্রসঙ্গে গোলাম মোস্তফা জানান, প্রতিদিন বিকেলের পর থেকেই রাজশাহী নগরের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ তাঁর চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবা নিতে ভিড় করেন। এদের একটি বড় অংশই খেটে খাওয়া মানুষ। গোলাম মোস্তফার কাছে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা নিতে আসা রাজশাহী নগরীর কাজলা এলাকার মরিয়ম বেগম (৩০), হাসনা বানুসহ (৭০) আরো বেশ কয়েকজন রোগীর সঙ্গে কথা হলে তাঁরা জানান, 'আমরা গরীব মানুষ। ফি দিয়ে এবং নিজ টাকা দিয়ে ওষুধপত্র কিনে চিকিৎসা চালানোর মত সামর্থ্য আমাদের নেই। জননী দাতব্য চিকিৎসালয়ে বিনামূল্যে রোগী দেখাসহ ওষুধপত্র প্রদান করা হয়। এ জন্য আমরা এখানে চিকিৎসা সেবা নিতে এসেছি'। তিনি বলেন, প্রতি মাসেই চিকিৎসা সেবা চালানোর জন্য নিজ থেকে প্রায় চার-পাঁচ হাজার টাকা বা কখনো তার বেশিও দিতে হয়। তিনি বলেন, দিনে দিনে রোগীর সংখ্যা ও ওষুধের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা এখন করুণ। এতকিছুর পরেও তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য তাঁর বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে চান।

(সাথের ছবিটা ইত্তেফাক পত্রিকায় আব্বুকে নিয়ে ছাপা হওয়া একটা লেখার ছবি।)

নাজমানি মর্তুজা'র

বাবা, তুমি আমার জীবনের প্রথম পৃথিবী

পৃথিবীর ইতিহাসে কিছু বাবা-মেয়ের সম্পর্ক রক্তের সম্পর্কের গণ্ডি পেরিয়ে উত্তরাধিকারের গল্প হয়ে উঠেছে। কেউ মেয়েকে দিয়েছেন জ্ঞানের উত্তরাধিকার, কেউ স্বাধীন চিন্তার, কেউ স্বপ্ন দেখার সাহস। রবীন্দ্রনাথের পরিবারে মেয়েদের শিক্ষা ও সৃজনশীলতার যে পরিসর তৈরি হয়েছিল, আব্রাহাম লিংকনের পারিবারিক চিঠিপত্রে যে মানবিকতার ছাপ, কিংবা আইনস্টাইনের চিঠিতে কন্যার প্রতি যে মমতা সবই মনে করিয়ে দেয়, একজন বাবা কখনো কখনো মেয়েকে শুধু ভালোবাসেন না তাঁর ভেতরে একটি পৃথিবী নির্মাণ করেন। আমার আব্বাও তাই করেছিলেন। তিনি আমাকে কোনো সম্পত্তির লোভ দেখাননি কোনোদিন। দিয়ে যাবেন বলে কোন প্রতিশ্রুতিও দেন নি । দিয়ে গেছেন রুচি, সাহস, বিচারবোধ আর বড় স্বপ্ন দেখার চোখ। আজ দূর দেশে বসে বুঝি, আমার জীবনের অনেকটা পথ আসলে তাঁর হাত ধরেই তৈরি হয়েছিল।

" হয়তো এটাই বাবা!
তাঁরা একদিন আমাদের হাত ছেড়ে দেন, কিন্তু এমনভাবে সাহস দিয়ে যান যে, সারাজীবন আমরা মনে করি পেছনে ফিরে তাকালেই বাবা আছেন। বাবা, তুমি আমার জীবনের প্রথম পৃথিবী। আর আমি যত পৃথিবীই দেখি, তোমার পৃথিবীর মতো আর কোনো পৃথিবী দেখি না।"

আমার প্রথম ডিজাইনার আব্বা

নব্বইয়ের দশক। আমাদের বাসায় আব্বা সানন্দে বা বেগম পত্রিকার স্পেশাল সংখ্যা যেমন পুজো পার্বণের, বিশেষ দিবসের সংখ্যা গুলো সংগ্রহ করে রাখতেন । আমরা তো শহরে বাস করতাম না তবে গ্রাম হলেও আদর্শ গ্রাম বলা যায় । আব্বা ছিলেন ভীষণ ফ্যাশনসচেতন। পত্রিকা থেকে জামার ডিজাইন কেটে রাখতেন, তারপর সেগুলো দেখে আমার ঈদের জামা বানাতেন। একবার ঈদের আগে আমাকে নিয়ে গেলেন গ্রামের এক দর্জির কাছে। তাঁর কোনো দোকান ছিল না। সোমবারের হাটে আমাদের শহরে বিশাল হাট বসে দুর দুরান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা এই হাটে যায় । বিশাল নামডাক আছে এই হাটের । গাছতলায় বসে লুঙ্গি সেলাই করতেন। অথচ তার ডিজাইন সেন্স এ হাতের কাজ ছিল অনন্য অসাধারণ। সেদিন আমি কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলাম, আব্বা, ভালো টেইলার্সে না দিয়ে এখানে কেন?
আব্বা হেসে বলেছিলেন, ওরা টেইলার। আর এই মানুষটা ডিজাইন-ার। ওর হাতের কাজের কাছে বড় বড় টেইলার কিছুই না। তুই দেখে নিস তোর ঈদের জামা হবে আনকমন আর গর্জিয়াস। সেদিন বুঝি-নি। আজ বুঝি, আব্বা আমাকে শুধু পোশাকের রুচি শেখাননি। শিখিয়েছিলেন মানুষের মূল্য তার দোকান বা অবস্থানে নয়, তার প্রতিভায়।

আমার গান শোনার কানটাও আব্বার তৈরি

শুধু পোশাকের রুচি নয়, গান শোনার কানটাও আব্বা তৈরি করে দিয়েছিলেন। আমাদের কৈশোরের সময় ব্যান্ডের গানের কী উন্মাদনাই না ছিল মাইলস, সোলস, ডিফারেন্ট টাচ। ক্যাসেট পেয়ারে সারাদিন গান বাজত। আব্বা বাড়িতে না থাকলে আমিও লুকিয়ে লুকিয়ে ব্যান্ডের গান শুনতাম। একদিন তেমনই গান শুনছি, খাতায় কী যেন লিখছি। হঠাৎ পেছন থেকে আব্বার গম্ভীর কণ্ঠ এগুলো কী শুনছিস? ঘুরে তাকাতেই দেখি, আব্বার মুখ অগ্নিমূর্তি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিনি

আমার হাত থেকে ক্যাসেটটা ছিনিয়ে নিয়ে সজোরে মেঝেতে আছাড় মারলেন। প্লাস্টিকের ক্যাসেটটা বিকট শব্দে ভেঙে ছড়িয়ে গেল। আমি ভয়ে একেবারে নিশ্চুপ। আব্বা বললেন, এই বাসায় আর এসব গান বাজবে না। গান শুনবি গানের মতো করে শুনবি। ধ্রুপদী শুনবি, খেয়াল-ঠুমরি শুনবি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল, লোকগান, লালন শুনবি। গানের কথা কী বলছে, সুর কোথায় যাচ্ছে, তার ভেতরে কী লুকিয়ে আছে সেটা বুঝতে শিখ। সেদিন আব্বার রাগটা আমার কাছে ছিল ভয়ংকর। আজ বুঝি, সেই রাগের আড়ালেও ছিল গভীর ভালোবাসা। তিনি চেয়েছিলেন, আমার কান শুধু গান শুনুক তা না সাথে গান চিনতেও শিখুক। তারপর থেকে আব্বা মাঝেমধ্যে আমার গানের পরীক্ষা নিতেন। রেডিওতে কোনো গান বাজলে হঠাৎ জিজ্ঞেস করতেন, কে গাইছে? কোন ধরনের গান? তখন মনে হতো, আব্বা বুঝি আমাকে খুব শাসন করেন। আজ বুঝি, তিনি আসলে আমার ভেতরে একটি শ্রুতিবোধ, একটি রুচি, একটি সংগীতবোধ তৈরি করছিলেন। জীবনে কত গান শুনেছি, কত সুরের ভেতর দিয়ে হেঁটেছি। কিন্তু গান শোনার যে কান সেটা আব্বারই তৈরি করে দেওয়া।

আধুনিক হেয়ার কাট

আমার চুল ছিল খুব ঘন লম্বা। কিন্তু যত্ন নিতে পারতাম না। বড় শহর গুলোতে তখন পার্লারও হাতে গোনা। ততটা পার্লারে যেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি আমরা। আব্বা নিজেই গিয়ে শিখে এলেন স্টেপ কাট। তারপর আমার চুলে প্রথম স্টেপ কাট তিনিই দিলেন। কলেজ পর্যন্ত আমার চুল কেটেছেন আব্বা। শ্যাম্পু করে দিয়েছেন । তেল দিয়ে দুই বেনী করে দিতেন আব্বা । দক্ষতার সাথে কিন্তু সবসময় একটা বেনী নিচু আর একটা উঁচু হতো বলে আমার কি যে রাগ হতো । আজ ভাবি, আমার প্রথম হেয়ারস্টাইলিস্টও ছিলেন আমার বাবা। তাঁর হাতে কাঁচি ছিল, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ছিল মায়া।

প্রথম প্রেমের প্রস্তাব আমার কৈশোরের থ্রিল

কৈশোরে হঠাৎ একদিন একটি ছেলে আমাকে প্রেমের প্রস্তাব দিল। আমি ভীষণ রেগে গিয়ে আব্বার কাছে অভিযোগ করলাম। ভাবলাম, তিনি রাগ করবেন। আচ্ছা করে ছেলেটাকে ধোলাই দেবেন ।তার বাবার কাছে নালিশ দেবেন। কিন্তু আব্বা বললেন, প্রত্যেক বয়সের একটা মুগ্ধতা থাকে, একটা পাগলামি থাকে। তুই মা এখন সেই বয়সটাতে, এটা জীবনের স্বাভাবিক অংশ। তারপর বললেন, কোন ছেলে ভালো, কোন ছেলে খারাপ, কার চোখে সম্মান আছে আর কার চোখে শুধু মুগ্ধতা সেটা বোঝার চোখ তোকেই তৈরি করতে হবে। তিনি আমাকে ভয় দেখাননি, নিষেধের দেয়ালও তোলেননি। বলেছিলেন, আমার কাছে বলতে ইচ্ছা করলে বলবি। না হলে নিজেই সামলাবি। জীবন তোকে নিজেকেই চিনতে হবে। আজ বুঝি, সেদিন তিনি আমাকে প্রেমের শিক্ষা দেননি। মানুষ চেনার শিক্ষা দিয়েছিলেন।

প্রথম সাইকেল রাইডের ঘটনা

প্রথম সাইকেল চালানো শেখার পর আমার খুব শখ হলো, আব্বাকে পেছনে বসিয়ে আমি চালাব। একদিন বললাম, আব্বা, তুমি ওঠো। তিনি উঠলেন। আমি আনন্দে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর পেছনটা কেমন হালকা লাগল। আব্বাও কোনো কথা বলছেন না। পেছনে তাকিয়ে দেখি আব্বা ধুলোর মধ্যে পড়ে আছেন! আমি সাইকেল ফেলে দৌড়ে গিয়ে বললাম,আব্বা, ব্যথা পেয়েছ? তিনি ধুলোমাখা অবস্থায় শুয়েই হাসতে হাসতে বললেন, আর একটু হলে তো ট্রাক এসে আমাকে পিষেই দিত! আজও সেই দৃশ্য মনে পড়লে হাসি পায়। মেয়ের আনন্দের জন্য বাবারা কখনো কখনো পড়ে গিয়েও হাসেন। একটা রিকশা আর আব্বার একটা ভবিষ্যদ্বাণী আমি যেন একা স্কুলে ও প্রাইভেটে যাতায়াত করতে পারি, আব্বা আমাকে একটা রিকশা কিনে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আজ থেকে তোর জীবনের সঙ্গে একটা রিকশা জুটে গেল। তারপর যেন ভবিষ্যৎ দেখে বলেছিলেন, একদিন তুই নিজেই গাড়ি চালাবি। গাড়ি চালিয়ে গোটা পৃথিবী ঘুরবি। আজ সত্যিই আমি গাড়ি চালাই। বাবাদের কিছু ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হতে একটু সময় লাগে।

বইপড়া আর বড় স্বপ্ন দেখার চোখ আব্বার খুলে দেওয়া

গল্পের বই পড়ার নেশাটাও আব্বার কাছ থেকে পাওয়া। তিনি আমাকে শুধু গল্পের বই নয়, বিখ্যাত মানুষের জীবনীও কিনে দিতেন। বলতেন, বড় বড় মানুষের জীবনী পড়বি। স্বপ্ন বড় হবে। তাদের জীবন আদর্শ নিজের মধ্যে ধারন

করতে পারবি। আর বলতেন, বড় শহর দেখবি, বড় বিল্ডিং দেখবি, ভালো বাড়ি দেখবি। মানুষের স্বপ্নও বড় হবে। তখন কথাগুলো ছিল বাবার সাধারণ উপদেশ। আজ বুঝি, তিনি আসলে আমার পৃথিবীর সীমানা বড় করে দিচ্ছিলেন।

বিয়ের পরও আমি সেই আব্বার ছোট্ট মেয়ে

বিয়ের পরেও আব্বার কাছে আমি বড় হয়ে উঠিনি। শীতের রাতে আমি আর আমার হাসব্যন্ড ঘুমিয়ে আছি। আব্বা দরজায় নক করে ঢুকে দেখতেন আমাদের পা ঠাণ্ডা হয়ে আছে কি না। কয়েল নিভে গেছে কিনা। মশারি ঠিকঠাক আছে কিনা ? আমাদের পায়ে হাত দিয়ে দেখতেন ঠান্ডা লাগছে কি না। আমার হাসব্যন্ড অবাক হয়ে বলত, তোমার বাবা এমন কেন? আজ বুঝি, কারণের নাম ছিল মায়া। আব্বার কাছে আমার হাসব্যান্ড কখনো আলাদা কেউ ছিলেন না। আমি যেমন তাঁর সন্তান, সেও তেমন। এমনটাই ভাবেন তিনি। বাবার মায়া সম্পর্কের হিসাব মানে না।

আমার প্রথম মাতৃত্বের দিনগুলো

আমার প্রথম সন্তান যখন আমার গর্ভে, মনে হতো এই যাত্রায় আমি একা নই। আমার সঙ্গে আব্বাও হাঁটছেন।আমি পা একটু তুলে শুলে তিনি পায়ের নিচে বালিশ দিয়ে দিতেন। নিজের হাতে মাথায় তেল দিতেন। কী খাব, কখন খাব, শরীর কেমন সবকিছুর দিকে তাঁর নজর। আমি শুধু বলতাম, আব্বা শরীরটা একটু খারাপ লাগছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসতেন। তাঁর নিজের বয়সটাকে যেন কখনো মনে রাখতেন না। শুধু মনে রাখতেন, তাঁর মেয়েটার যেন কিছু না হয়। সেই সন্তানকে আমি হারিয়েছিলাম। কিন্তু সেই কঠিন সময়ের সবচেয়ে কোমল স্মৃতিগুলোর মধ্যে রয়ে গেছে আব্বার সেই যত্ন মাথায় তাঁর হাত, পায়ের নিচে বালিশ, আর অস্থির কণ্ঠে বারবার জিজ্ঞেস করা, কী লাগবে?

ভালোবাসার ছোট ছোট কাজ গুলো

কলেজ পর্যন্ত আব্বা আমার নখ কেটে দিয়েছেন। রান্না করে খাইয়েছেন। মাথায় ঝুঁটি করে দিয়েছেন। তখন এসবকে আলাদা করে ভালোবাসা বলে চিনিনি। এগুলোই তো ছিল আমার স্বাভাবিক জীবন। এখন বুঝি, ভালোবাসা সবসময় বড় কোনো ঘোষণায় আসে না। কখনো একটি কাঁচি হাতে আসে। কখনো একটি বালিশ পায়ের নিচে এসে ঠেকে। কখনো একটি বই হাতে তুলে দেওয়া হয়। কখনো ধুলোর মধ্যে পড়ে থাকা একজন বাবা হেসে বলেন, আর একটু হলে ট্রাকটা আমাকে পিষেই দিত! এখন বুঝি শৈশবে মনে হয়, বাবা থাকবেনই। তাঁর কণ্ঠ থাকবে, তাঁর বকুনি থাকবে, তাঁর হাত থাকবে মাথার ওপর। তারপর জীবন আমাদের দূরে নিয়ে যায়। দেশ বদলায়, ঘর বদলায়, ঠিকানা বদলায়। আর তখনই বোঝা যায়, বাবার উপস্থিতি আসলে কত বড় একটি আশ্রয় ছিল। দূর দেশে বসে আজ যখন কোনো ছোট্ট অসুবিধায় নিজেকেই নিজে সামলাতে হয়, মনে পড়ে যায় সেই মানুষটির কথা, যিনি আমার সামান্য উফ শব্দটাকেও গুরুত্ব দিতেন।

মনে পড়ে যায় গাছতলার সেই দর্জি। সানন্দা থেকে কেটে রাখা ডিজাইন। আমার চুলে আব্বার কাঁচি। ক্যাসেট ভেঙে ফেলা সেই অগ্নিমূর্তি। রেডিওর সামনে নেওয়া গানের পরীক্ষা। প্রথম প্রেমের দিনে তাঁর শান্ত শিক্ষা। সাইকেলের ধুলোর মধ্যে তাঁর হাসি। একটি রিকশার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী। বইয়ের পাতায় বড় স্বপ্ন দেখানোর শিক্ষা। আর আমার গর্ভাবস্থায় পায়ের নিচে রাখা সেই বালিশ। সবকিছু মিলিয়ে আজ বুঝি, আমার আব্বা আমাকে শুধু বড় করেননি। তিনি আমার পৃথিবীটা বড় করে দিয়েছিলেন। আমার স্বপ্নের সীমানা বাড়িয়েছিলেন। মানুষ চেনার চোখ দিয়েছিলেন। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সাহস দিয়েছিলেন। আর এমন এক ভালোবাসা দিয়েছিলেন, যার মূল্য আমি সবচেয়ে বেশি বুঝেছি দূরে এসে। আজ আমি গাড়ি চালাই। পৃথিবীর পথে চলি। নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিই। তবু আমার ভেতরে সেই ছোট্ট মেয়েটা রয়ে গেছে, যে একদিন সাইকেল চালিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখেছিল আব্বা নেই! আজও মনে হয়, আমি যত দূরেই যাই, পেছনে তাকালে তাঁকে দেখতে পাব। ধুলোমাখা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। হেসে বলছেন, চালিয়ে যা। আমি আছি। হয়তো এটাই বাবা!

তাঁরা একদিন আমাদের হাত ছেড়ে দেন, কিন্তু এমনভাবে সাহস দিয়ে যান যে, সারাজীবন আমরা মনে করি পেছনে ফিরে তাকালেই বাবা আছেন। বাবা, তুমি আমার জীবনের প্রথম পৃথিবী। আর আমি যত পৃথিবীই দেখি, তোমার পৃথিবীর মতো আর কোনো পৃথিবী দেখি না।

মাহবুব সিরাজ তুহিন'এর

বাবা দিবসে আব্বাকে মনে পড়ে

> একসময় যে সন্তান বাবার হাত ধরে পথ চলতে শেখে, সে-ই একদিন নিজের সাফল্যের পথে এগিয়ে যায়। আর বাবা কখনো সামনে থেকে পথ দেখায় কখনো পেছনে দাঁড়িয়ে সমর্থন দেন, আবার কখনো শুধু নীরবে সন্তানের অর্জনের দিকে তাকিয়ে গর্ব অনুভব করেন। প্রজন্ম বদলায়, সময় বদলায়, প্রযুক্তি বদলায়। তবুও কিছু বিষয় বদলায় না। বাবার ভালোবাসা বদলায় না।

একটি ছবি, একটি নাম, একটি বিশ্ববিদ্যালয় জীবন আর প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বয়ে চলা বাবার ভালোবাসা। আজকের পৃথিবীতে স্মৃতি ধরে রাখা খুব সহজ। হাতে স্মার্টফোন থাকলে জীবনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্তই এখন ছবিতে বা ভিডিওতে ধরে রাখা যায়। সন্তানের জন্ম, স্কুলে প্রথম যাওয়া, জন্মদিন, পারিবারিক অনুষ্ঠান, ভ্রমণ কিংবা জীবনের কোনো বিশেষ অর্জন সবকিছুই মুহূর্তের মধ্যে ক্যামেরাবন্দি হয়ে যায়। কখনো কখনো মনে হয়, আমরা যেন ছবি তুলতে তুলতেই জীবন পার করে দিচ্ছি। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সময়টা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তখন আজকের মতো স্মার্টফোন ছিল না, মুহূর্তে মুহূর্তে ছবি তোলার সুযোগও ছিল না। একটি ছবি তুলতে হলে ক্যামেরা লাগত, ফিল্ম লাগত, তারপর সেই ছবি ডেভেলপ করার জন্য অপেক্ষা করতে হতো। ফলে জীবনের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত কোনো ছবিতে বন্দি হয়নি। আব্বার সঙ্গে আমার ছবিও তাই খুব বেশি নেই। কিন্তু আজ মনে হয়, ছবির সংখ্যা হয়তো কম, স্মৃতির সংখ্যা নয়। বরং যে অল্প কয়েকটি ছবি আছে, সেগুলোর প্রতিটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে জীবনের গভীর কোনো গল্প, কোনো আবেগ এবং কোনো না বলা কথা।

বাবা দিবস এলে পুরোনো ছবিগুলোর দিকে তাকানোর একটি আলাদা অনুভূতি তৈরি হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেক দূরে চলে আসি, দেশ বদলায়, শহর বদলায়, জীবন বদলায়, দায়িত্ব বদলায়। একসময় যে মানুষটি বাবার হাত ধরে স্কুলে যেত, সে-ই একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যায়। তারপর কর্মজীবনে প্রবেশ করে, নিজের পরিবার গড়ে তোলে, সন্তানদের বড় হতে দেখে। কিন্তু জীবনের এই দীর্ঘ পথের কোথাও না কোথাও বাবা থেকে যান। কখনো তাঁর কোনো উপদেশে, কখনো তাঁর শেখানো কোনো মূল্যবোধে, কখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহসে, আবার কখনো কোনো পুরোনো ছবির মধ্যে।

আমার কাছে এমনই একটি বিশেষ ছবি জড়িয়ে আছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের সঙ্গে। তখন আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় জীবন এমনিতেই জীবনের একটি বিশেষ সময়। একদিকে পড়াশোনা, অন্যদিকে বন্ধুত্ব, আড্ডা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক সচেতনতা, নানা স্বপ্ন এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা সবকিছু মিলিয়ে এক অন্যরকম জীবন। কিন্তু কোনো এক ছুটিতে নানা একাডেমিক চাপের কারণে বাড়ি যাওয়া সম্ভব হয়নি। অন্য সবাই যখন যার যার বাড়িতে চলে গেছে, আমি থেকে গিয়েছিলাম ক্যাম্পাসে। ছুটির সময় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের চেহারা একেবারেই বদলে যায়। সাধারণ সময়ে যে ক্যাম্পাস হাজারো শিক্ষার্থীর পদচারণায় মুখর থাকে, যেখানে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আড্ডা, হাসি, আলোচনা, বিতর্ক এবং নানা কর্মকাণ্ড চলতে থাকে, ছুটির দিনে সেই

একই জায়গা যেন সম্পূর্ণ অন্য এক জগৎ হয়ে যায়। হলগুলো ফাঁকা, পরিচিত রুমগুলোর দরজা বন্ধ, বন্ধুদের দেখা নেই। ক্যানটিন বন্ধ, ডাইনিং বন্ধ। সন্ধ্যা নামলে করিডোরগুলো আরও নির্জন হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে স্বাধীনতার একটি আলাদা আনন্দ থাকে। নিজের সময় নিজের মতো করে কাটানো, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে জীবন ভাগ করে নেওয়া সবকিছুর মধ্যে এক ধরনের মুক্তির অনুভূতি কাজ করে। কিন্তু কখনো কখনো সেই স্বাধীনতার মাঝেও নিঃসঙ্গতা এসে দাঁড়ায়। বিশেষ করে যখন চারপাশের সবাই বাড়ি চলে যায় আর আপনি থেকে যান প্রায় ফাঁকা একটি ক্যাম্পাসে। খাবারদাবারের ব্যবস্থাও তখন নিজেদের মতো করে করতে হতো। কখনো কোথাও থেকে খাবার সংগ্রহ করা, কখনো কোনোভাবে ব্যবস্থা করা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সেই ছোটখাটো কষ্টগুলো তখন হয়তো খুব স্বাভাবিকই মনে হতো। তরুণ বয়সে মানুষ অনেক কিছুই সহজভাবে নেয়। সামান্য অসুবিধা, অনিশ্চয়তা কিংবা কষ্ট তখন জীবনের অংশ বলেই মনে হয়। কিন্তু বাবা-মায়ের কাছে সন্তানের কষ্ট কখনোই ছোট মনে হয় না। কীভাবে যেন বাড়িতে খবর পৌঁছে গেল আমি ছুটির সময়ও ক্যাম্পাসে আছি, ডাইনিং ও ক্যানটিন বন্ধ, খাবারদাবার নিয়ে কিছুটা কষ্ট হচ্ছে। আজও জানি না খবরটি ঠিক কীভাবে আব্বা-আম্মার কাছে পৌঁছেছিল। হয়তো কোনো পরিচিত মানুষ বলেছিলেন, হয়তো কারও সঙ্গে কথার প্রসঙ্গে তাঁরা জেনেছিলেন। কিন্তু খবরটি শোনার পর তাঁদের প্রতিক্রিয়া ছিল খুব স্বাভাবিক একজন বাবা ও একজন মায়ের প্রতিক্রিয়া। তাঁরা চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। আজ যখন নিজেই বাবা, তখন সেই অনুভূতিটা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারি। সন্তান বয়সে যতই বড় হোক, বাবা-মায়ের চোখে সে কখনো পুরোপুরি বড় হয় না। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুক, চাকরি করুক, নিজের পরিবার গড়ুক কিংবা পৃথিবীর অন্য প্রান্তে চলে যাক বাবা-মায়ের মনে কোথাও না কোথাও সে সেই আগের সন্তানই থেকে যায়। তারপর ঘটল সেই ঘটনা, যা আজ এত বছর পরও মনে করলে হৃদয় ভরে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই আব্বা-আম্মাসহ পরিবারের সবাই বিশাল খাবারের আয়োজন নিয়ে হাজির হলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মওলানা ভাসানী হলে। তাঁদের গন্তব্য আমার ২০৩ নম্বর রুম। আজও ভাবলে অবাক লাগে। আমি হয়তো তখন ভাবতেই পারিনি, দূরে থাকা বাবা-মা সন্তানের একটি ছোট্ট অসুবিধার খবর শুনে এভাবে সবকিছু ফেলে ছুটে আসতে পারেন। তাঁরা শুধু আমাকে দেখতে আসেননি। তাঁরা এসেছিলেন নিশ্চিত হতে আমি ভালো আছি কি না, ঠিকমতো খেয়েছি কি না, কোনো কষ্ট হচ্ছে কি না। আর সঙ্গে ছিল খাবার। অনেক খাবার। আজ মনে হয়, সেই খাবারের স্বাদ হয়তো কোনো নামকরা রেস্টুরেন্টের খাবারের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো খাবারের একটি স্বাদ হয়তো সেদিনই পেয়েছিলাম।

মওলানা ভাসানী হলের নিচতলার করিডোরে দাঁড়িয়ে তোলা সেই ছবিটি তাই আমার কাছে শুধুই একটি পারিবারিক ছবি নয়। এটি একটি গল্প। এটি একটি সময়ের দলিল। এটি এমন একটি মুহূর্তের স্মৃতি, যখন হয়তো আমি আরও গভীরভাবে অনুভব করেছিলাম পরিবার কখনো সত্যিকার অর্থে দূরে থাকে না। ভৌগোলিক দূরত্ব থাকতে পারে, কিন্তু ভালোবাসার দূরত্ব থাকে না। আমার আব্বা ছিলেন একজন রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সচেতন মানুষ। তাঁর ব্যক্তিত্বের এই দিকটি আমাদের পরিবার এবং আমাদের সন্তানজীবনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সন্তানদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিয়ে পরিবারে উদ্বেগ থাকা খুবই স্বাভাবিক। বিশেষ করে ছাত্ররাজনীতিতে জড়ানোর বিষয়ে বাবা-মায়েরা প্রায়ই দ্বিধায় থাকেন। কিন্তু আমার আব্বা ছিলেন কিছুটা ভিন্ন ধরনের মানুষ। তিনি শুধু রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না, তিনি আমাদের সমাজ ও দেশ সম্পর্কে সচেতন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করতেন।

আব্বা আমাদের কখনো ক্ষমতার রাজনীতি শেখাননি। তিনি শেখাতেন মানুষের জন্য রাজনীতি করতে। পদ পাওয়ার জন্য নয়। ক্ষমতা অর্জনের জন্য নয়। নিজেকে বড় মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নয়। বরং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। তাঁর কাছে রাজনীতি ছিল মানুষের সেবা করার একটি মাধ্যম। একজন অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, কারও সমস্যা শুনে সমাধানের চেষ্টা করা, নিজের সামর্থ্যের মধ্যে সাহায্য করা কিংবা কাউকে সঠিক পথ দেখানো এসবও তাঁর কাছে মানুষের জন্য কাজ করার অংশ ছিল। আজকের দিনে রাজনীতিকে নিয়ে নানা আলোচনা ও বিতর্কের মধ্যে দাঁড়িয়ে আব্বার সেই দর্শন আরও বেশি মনে পড়ে। ক্ষমতা ক্ষণস্থায়ী হতে পারে, পদ পরিবর্তিত হতে পারে, পরিচিতি বদলে যেতে পারে কিন্তু মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেওয়া যায় কেবল মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে।

আব্বার আরেকটি অসাধারণ গুণ ছিল তিনি আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা দিতেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি আমাদের নিজের সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করতেন। আমরা কী পড়ব, কোন পথে এগোব, ভবিষ্যতে কী করব এসব বিষয়ে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ও মতামত দিতেন, ভালো-মন্দ বুঝিয়ে দিতেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দিতেন। আজ বুঝি, সন্তানকে স্বাধীনতা দেওয়া সহজ নয়। কারণ স্বাধীনতা মানে ভুল করার সুযোগও দেওয়া। নিজের সিদ্ধান্তে ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকিও থাকে। জীবন সবসময় পরিকল্পনা অনুযায়ী চলে না। ভুল হয়, পথ বদলায়, মানুষ কষ্ট পায়, কোনো সিদ্ধান্ত পরে ভুল বলেও মনে হতে পারে। তারপরও সন্তানকে নিজের সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া মানে তাকে বিশ্বাস করা। আমার আব্বা আমাদের বিশ্বাস করতেন।

আমার নামের সঙ্গেও আব্বাকে ঘিরে একটি সুন্দর গল্প আছে। আমার জন্ম ডিসেম্বর মাসে। বাংলাদেশের ডিসেম্বরের রাত, শীতের আবহাওয়া, আর সেই সময়ের একটি বিশেষ পারিবারিক পরিবেশ সবকিছু মিলিয়ে আমার জন্মের গল্পটি আমার কাছে সবসময়ই বিশেষ। সেই রাতে সারা রাতব্যাপী কাওয়ালি ও আধ্যাত্মিক সংগীতের একটি আয়োজন ছিল। আনন্দমুখর সেই পরিবেশের মধ্যেই ডিসেম্বরের এক শীতল মধ্যরাতে আমার জন্ম। পরিবারের সবাই আনন্দে ভরে উঠেছিলেন। আর সেই আনন্দের মুহূর্তেই আমার নাম রাখা হয় তুহিন। তুহিন নামটির সঙ্গে শীতলতা ও শীতের আবহের সম্পর্ক রয়েছে। আমার আরেক নাম মাহবুব। এর অর্থ প্রিয় বা ভালোবাসার যোগ্য ব্যক্তি। দুটি নাম, দুটি ভিন্ন অর্থ একটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ডিসেম্বরের শীতল রাত, অন্যটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভালোবাসা। আর দুটি নামের পেছনেই আছে একটি পরিবার এবং একজন বাবার স্নেহের ছায়া।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মায়ের ভালোবাসার অর্থও যেন বদলে যায়। ছোটবেলায় আমরা অনেক কিছুই স্বাভাবিক বলে ধরে নিই। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝতে শুরু করি, এগুলো মোটেও স্বাভাবিক কোনো ঘটনা ছিল না। এগুলো ছিল নিঃস্বার্থ ভালোবাসার প্রকাশ। একসময় সন্তান নিজেও বাবা বা মা হয়। তখন সে বুঝতে শুরু করে, একটি সন্তানের জন্য চিন্তা করার অর্থ কী। আজ যখন আমার ছেলে আহনাফের সঙ্গে তোলা ছবিটির দিকে তাকাই, তখন এই অনুভূতিটি আরও গভীর হয়ে ওঠে। এই ছবিতে আহনাফ তার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জনের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে গ্র্যাজুয়েশনের পোশাকে। তার হাতে সনদ, মুখে হাসি। আর তার পাশে আমি একজন বাবা। এখানে আমি যেন সময়ের একটি পূর্ণ বৃত্ত দেখতে পাই। একদিন আমি ছিলাম সন্তান। আমার আব্বা ছিলেন আমার বাবা। তিনি আমার জন্য চিন্তা করতেন, আমার সিদ্ধান্তকে সম্মান করতেন, আমাকে নিজের পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিতেন এবং জীবনের ছোট-বড় প্রতিটি মুহূর্তে নিজের মতো করে পাশে থাকতেন। আজ আমি নিজেই একজন বাবা। আহনাফ নিজের জীবনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। একসময় যে সন্তান বাবার হাত ধরে পথ চলতে শেখে, সে-ই একদিন নিজের সাফল্যের পথে এগিয়ে যায়। আর বাবা কখনো সামনে থেকে পথ দেখায় কখনো পেছনে দাঁড়িয়ে সমর্থন দেন, আবার কখনো শুধু নীরবে সন্তানের অর্জনের দিকে তাকিয়ে গর্ব অনুভব করেন। প্রজন্ম বদলায়, সময় বদলায়, প্রযুক্তি বদলায়। তবুও কিছু বিষয় বদলায় না। বাবার ভালোবাসা বদলায় না। আজ বাবা দিবসে আব্বাকে মনে পড়লে তাই শুধু অতীতের কথা মনে পড়ে না। মনে হয়, তাঁর দেওয়া শিক্ষা এখনও আমাদের সঙ্গে আছে। মানুষের জন্য কিছু করার শিক্ষা, নিজের সিদ্ধান্তের দায়িত্ব নেওয়ার শিক্ষা, স্বাধীনভাবে চিন্তা করার শিক্ষা এবং পরিবারকে ভালোবাসার শিক্ষা। সব বাবা তাঁদের সন্তানদের হৃদয়ে বেঁচে থাকেন, পৃথিবীর সকল বাবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। যাঁরা আজও সন্তানের হাত ধরে পথ দেখাচ্ছেন, তাঁদের প্রতি ভালোবাসা। যাঁরা দূরে থেকেও সন্তানের জন্য প্রতিদিন চিন্তা করেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা। আর যাঁদের বাবা আজ আমাদের মাঝে নেই, তাঁদের জন্য রইল আন্তরিক দোয়া ও প্রার্থনা। বাবা কখনো সত্যিকার অর্থে দূরে চলে যান না। তিনি থেকে যান তাঁর সন্তানের হৃদয়ে।

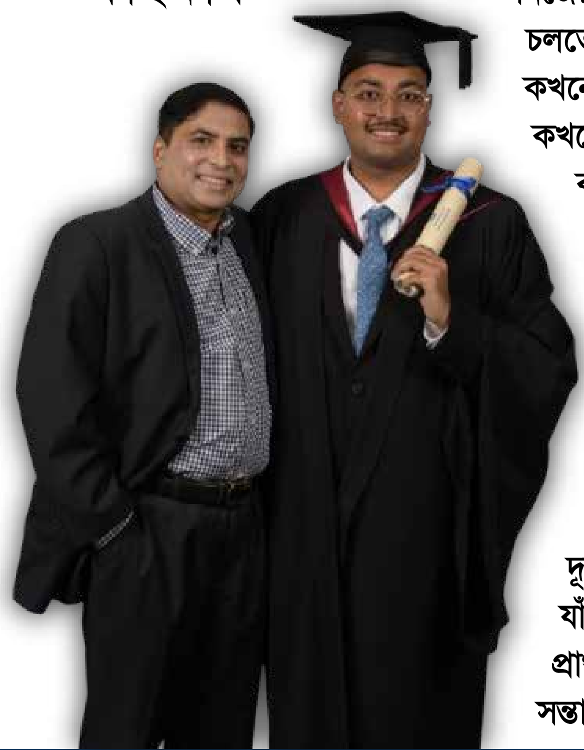

শৌভনিক দত্ত'র

বাবার দেওয়া উপহার

হাজার বছরের সেই দীর্ঘ যাত্রায় অসংখ্য বাবার জীবন জড়িয়ে আছে আমাদের আজকের অস্তিত্বের সঙ্গে। কেউ সন্তানের হাত ধরে বহুটা পথ হাঁটার সুযোগ পেয়েছেন, কেউ হয়তো খুব অল্প সময়। কেউ থেকে গেছেন স্মৃতিতে, কেউ গল্পে, কেউ একটি পুরনো ছবিতে। আবার কারও সম্পর্কে সন্তান হয়তো কিছুই জানে না। তবু তাঁদের অস্তিত্ব হারিয়ে যায় না।

একটি মানুষের জন্মের পেছনে কতজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন? হিসাবটা খুব সহজ। কিন্তু একটু গভীরভাবে ভাবলে বিস্ময়কর। আমাদের প্রত্যেকের জন্মের পেছনে আছেন দুজন মানুষ, বাবা ও মা। সেই বাবা ও মায়ের জন্মের পেছনে আছেন তাঁদের বাবা মা, অর্থাৎ চারজন। সেই চারজনের পেছনে আটজন। তারপর ষোলো, বত্রিশ, চৌষট্টি, একশো আটাশ। এভাবে প্রতি প্রজন্মে সংখ্যাটা দ্বিগুণ হতে থাকে। এই হিসাব ধরে কয়েকশো বছর, কিংবা হাজার বছর পেছনে গেলে একসময় সংখ্যাগুলো আর শুধু সংখ্যা থাকে না। মনে হয়, আমাদের প্রত্যেকের আজকের এই পৃথিবীতে এসে দাঁড়ানোর পেছনে রয়েছে মানুষের এক দীর্ঘ, বিস্ময়কর যাত্রা।

আমরা কেউ একা নই। আমাদের শরীরে, রক্তে, চেহারায়, স্বভাবে, হাঁটার ভঙ্গিতে, এমনকি কথা বলার ধরনেও হয়তো রয়ে গেছে বহু প্রজন্মের অদৃশ্য ছাপ। যাঁদের অনেকের নাম আমরা জানি না, মুখ দেখিনি, গল্পও শুনিনি। তবু তাঁদের জীবনের কিছু না কিছু এসে পৌঁছেছে আমাদের মধ্যে। আর সেই দীর্ঘ শিকলের সবচেয়ে কাছের কয়েকটি নামের একটি হলো বাবা। একটি শিশুর কাছে অবশ্য বাবা কোনো বংশপরম্পরার হিসাব নন। বাবা প্রথমে খুব পরিচিত একজন মানুষ। যে মানুষটির আঙুল ধরে রাস্তা পার হওয়া যায়। যার কাঁধে চড়ে পৃথিবীটাকে একটু উঁচু থেকে দেখা যায়। যে সাইকেলের পেছনটা ধরে দৌড়াতে দৌড়াতে একসময় নিঃশব্দে হাত ছেড়ে দেয়, অথচ শিশুটি বুঝতেই পারে না যে সে এখন নিজেই ভারসাম্য রাখতে শিখেছে।

সব বাবাই অবশ্য একই রকম নন। কেউ খুব কথা বলেন। কেউ কম। কেউ সন্তানকে জড়িয়ে ধরে ভালোবাসা প্রকাশ করেন, কেউ হয়তো সারাজীবন সেই কথাটি মুখেই বলতে পারেন না। কেউ গল্প শোনান, কেউ অঙ্ক শেখান, কেউ মাঠে নিয়ে যান, কেউ দূরে কোথাও কাজ করেন। কারও হাতে বই, কারও হাতে কলম, কারও হাতে হাতুড়ি, কারও হাতে স্টিয়ারিং, কারও হাতে মাটি।

প্রকাশের ভাষা আলাদা হলেও একটি জায়গায় অনেক বাবার গল্প মিলে যায়। তাঁরা চান, সন্তান যেন তাঁদের চেয়ে একটু ভালো থাকে। হয়তো এই চাওয়াটাই পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো উত্তরাধিকারগুলোর একটি। একজন বাবা নিজের জীবনে যে পথটুকু হেঁটেছেন, তিনি চান তাঁর সন্তান যেন সেখান থেকে আরও একটু সামনে যেতে পারে। তিনি হয়তো বড় কোনো সম্পদ রেখে যেতে পারবেন না। কিন্তু রেখে যেতে পারেন সততা। দায়িত্ববোধ। পরিশ্রমের অভ্যাস। মানুষের প্রতি সম্মান। অন্যায়ের সামনে মাথা না নোয়ানোর শিক্ষা। কখনও রেখে যান একটি বই। কখনও একটি গান। কখনও বাড়ির উঠোনে লাগানো একটি গাছ। কখনও এমন একটি বাক্য, যার অর্থ সন্তান বুঝতে পারে বহু বছর পরে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবার সংজ্ঞাটাও তাই বদলে যায়। শৈশবে বাবা শক্তির প্রতীক। মনে হয়, বাবা সব পারেন। কৈশোরে কখনও মনে হয়, বাবা অনেক কিছুই বোঝেন না। তারপর জীবন একটু একটু করে নিজের দায়িত্ব আমাদের হাতে তুলে দেয়। সংসার আসে, সিদ্ধান্ত নিতে হয়, ভুল হয়, আবার উঠে দাঁড়াতে হয়। একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করি, বাবার বলা কোনো কথাই হয়তো আমরা পরের প্রজন্মকে বলছি। যে কথায় একসময় বিরক্ত হয়েছিলাম, সেই কথাই এখন নিজের মুখে। তখন হয়তো প্রথম বুঝতে শুরু করি, বাবা আসলে কী দিতে চেয়েছিলেন। সব বাবার গল্পের শেষটাও এক নয়। কারও বাবা পাশে আছেন। কেউ দূরে থাকেন। কারও সঙ্গে প্রতিদিন কথা হয়। কারও সঙ্গে বছরে কয়েকবার। আবার কারও বাবা এখন শুধুই স্মৃতিতে। কারও জীবনে বাবার উপস্থিতি ছিল খুব অল্প সময়ের। কেউ

হয়তো বাবাকে দেখার সুযোগই পাননি। তবু দেখা হোক বা না হোক, স্মৃতি থাকুক বা না থাকুক, বাবা থেকে যান। আমাদের শরীরে তাঁর উত্তরাধিকার থাকে। কখনও চেহারায়, কখনও কণ্ঠস্বরে, কখনও শক্তিতে, কখনও স্বভাবে। আর যাঁরা বাবাকে কাছে পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে এর সঙ্গে থেকে যায় তাঁর স্পর্শ, শিক্ষা, অভ্যাস, মূল্যবোধ আর ভালোবাসা। হয়তো এভাবেই একজন বাবা তাঁর নিজের জীবনের সীমানা পেরিয়ে আরও অনেক দূর পর্যন্ত থেকে যান।

যাঁদের বাবা আর নেই, তাঁদের কাছে একটি পুরনো ছবি কখনও সময়ের দরজা হয়ে ওঠে। ছবির মানুষটি আর বয়স বাড়ান না। তাঁর চুল আর পাকে না। মুখে নতুন বলিরেখা পড়ে না। তিনি ছবির ভেতরে একই বয়সে থেকে যান। শুধু ছবির বাইরে থাকা মানুষগুলোর বয়স বাড়তে থাকে। কখনও নিজের কোনো আচরণে, কোনো সিদ্ধান্তে, কোনো কথায় হঠাৎ বাবার ছায়া খুঁজে পাওয়া যায়। কখনও পরের প্রজন্মের হাত ধরে রাস্তা পার হতে গিয়ে মনে পড়ে বহু বছর আগের আরেকটি হাতের কথা। এইভাবেই কি মানুষ থেকে যায়? এক প্রজন্ম আরেক প্রজন্মের হাতে জীবন তুলে দেয়। শুধু জীবন নয়, সঙ্গে দেয় ভাষা, স্মৃতি, অভ্যাস, মূল্যবোধ, স্বপ্ন এবং অসমাপ্ত কিছু ইচ্ছা।

আবার সেই সংখ্যার হিসাবটায় ফিরে যাওয়া যাক। দুই থেকে চার। চার থেকে আট। আট থেকে ষোলো। সংখ্যাগুলো একদিকে আমাদের নিয়ে যায় শত শত বছর পেছনে। সেখানে অসংখ্য বাবা ছিলেন। তাঁদের কাউকে আমরা চিনি, অধিকাংশকেই চিনি না। তাঁদের জীবন, তাঁদের শরীর, তাঁদের শক্তি, তাঁদের অস্তিত্বের কোনো না কোনো অংশ প্রজন্ম পেরিয়ে এসে মিশেছে আমাদের মধ্যে। অন্যদিকে একই হিসাব এগিয়ে যায় ভবিষ্যতের দিকে।

আজকের প্রজন্ম একদিন জায়গা করে দেবে পরের প্রজন্মকে। আমরা যে মানুষগুলোকে কোনোদিন দেখব না, তাদের কাছেও হয়তো কোনো না কোনোভাবে পৌঁছে যাবে আজকের একটি শিক্ষা, একটি মূল্যবোধ, একটি ভালোবাসা। এভাবেই জীবন থেমে থাকে না। এক প্রজন্মের কিছুটা বয়ে যায় পরের প্রজন্মে, তারপর তারও পরের প্রজন্মে। তাই বাবা দিবস শুধু বাবাকে একটি উপহার দেওয়া কিংবা একটি দিনের শুভেচ্ছা জানানোর উপলক্ষ নয়। এটি হয়তো একটু থেমে ভাবার দিনও। আমরা কোথা থেকে এসেছি। আমাদের মধ্যে কারা বেঁচে আছেন। আর আমাদের কাছ থেকে কী বয়ে যাবে ভবিষ্যতের দিকে।

হাজার বছরের সেই দীর্ঘ যাত্রায় অসংখ্য বাবার জীবন জড়িয়ে আছে আমাদের আজকের অস্তিত্বের সঙ্গে। কেউ সন্তানের হাত ধরে বহুটা পথ হাঁটার সুযোগ পেয়েছেন, কেউ হয়তো খুব অল্প সময়। কেউ থেকে গেছেন স্মৃতিতে, কেউ গল্পে, কেউ একটি পুরনো ছবিতে। আবার কারও সম্পর্কে সন্তান হয়তো কিছুই জানে না। তবু তাঁদের অস্তিত্ব হারিয়ে যায় না। দেখা হোক বা না হোক, জানা হোক বা না হোক, আমাদের অস্তিত্বের কোথাও না কোথাও বাবা থেকে যান। শরীরে, উত্তরাধিকারে, স্মৃতিতে, শিক্ষায়, কিংবা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে বয়ে চলা জীবনের সেই অদৃশ্য ধারায়। আমরা সবাই সেই দীর্ঘ যাত্রারই একটি ক্ষণিক অধ্যায়। আগের প্রজন্ম থেকে জীবন এসে পৌঁছায় আমাদের কাছে। আমরা তাতে যোগ করি আমাদের সময়, আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের ভালোবাসা। তারপর জীবন এগিয়ে যায় তার নিজের পথে। দুই থেকে চার। চার থেকে আট। আট থেকে ষোলো। হিসাবটা চলতেই থাকে। আর সেই অসীম হিসাবের মধ্যে বাবা দিয়ে যান এমন একটি উপহার, যা কোনো বাক্সে ভরা যায় না, যার কোনো মূল্য লেখা থাকে না। জীবন। তার সঙ্গে, কারও জন্য স্মৃতি। কারও জন্য শিক্ষা। কারও জন্য ভালোবাসা। কারও জন্য পথ দেখানোর একটি হাত। আর সেই জীবন থেকেই আবার জন্ম নেয় নতুন জীবন, নতুন স্বপ্ন, নতুন গল্প। হয়তো এটাই বাবার দেওয়া সবচেয়ে বড় উপহার।

রায়হান সাদ ফেরদৌসী'র

শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ ও সংগীতানুরাগী: এক অনন্য ব্যক্তিত্বের গল্প

বিশ্বের সকল বাবাকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও অফুরন্ত ভালবাসা। প্রত্যেক বাবাই তার পরিবারের জন্য একটি বটবৃক্ষ। এই বটবৃক্ষের শাখা প্রশাখাই মা, ভাই, বোন, পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও আত্মীয়স্বজন। বাবার নিজের জীবনের চাহিদা সামান্য, কিন্তু অন্য সবার জন্য উদার। বাবা নিঃস্বার্থ ভাবে সকলের প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

আজ এই বাবা দিবসে আমি আমার বাবা সম্পর্কে কিছু বলব। আমরা ভাই-বোনরা বাবাকে 'আব্বা' বলে ডাকতাম। আমার আব্বার নাম মোহাম্মদ আব্দুর রহিম। একজন শিক্ষক। তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এইচ. এস.সি এবং বি. এ. পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এড এবং এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। আব্বা শিক্ষকতার পেশা শুরু করেন জামালপুর জেলার বকসিগঞ্জ হাই স্কুল থেকে। পরবর্তীতে তিনি শ্রীবর্দী হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হেডমাস্টার হিসেবে কাজ করেন। তিনি ঢাকায় তেজগাঁও পলিটেকনিক্যাল গার্লস হাই স্কুলের সহকারী হেডমাস্টার হিসেবে দাযি ত্ব পালন করেন। তারপর তিনি সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে স্বার্থকতার সাথে কাজ করেন। সর্বশেষ তিনি ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

আব্বা একজন দক্ষ ভাষাবিদ ছিলেন। তিনি বাংলা, ইংরেজি ও আরবী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। উনি বাংলা একাডেমী থেকে নিয়মিত লেখালেখি করতেন। বাংলা, ইংরেজি এবং আরবী ভাষায় লেখা বই এনে বাংলা, ইংরেজি এবং আরবী ভাষায় অনুবাদ করতেন। আরবীতে লেখা 'মেরাতুল উরুস' নামে একটি আরবী উপন্যাস তিনি বাংলা ও ইংরেজীতে অনুবাদ করার জন্য বাংলা একাডেমী থেকে পুরস্কৃত হয়েছিলান। আব্বা নিয়মিত রেডিও টক শো তে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি ঢাকা বোর্ড অফিসের টেবুলেটর হিসেবে কাজ করতেন।

আব্বা একজন সংস্কৃতিমনস্ক, একাধারে সংগীত অনুরাগী, শিক্ষানুরাগী ও স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বাসায় মাঝে মাঝে গানের আসর বসলে সেই সমস্ত আসরে খ্যাতনামা শিল্পী যেমন ওস্তাদ ফজলুল হক ও বেদাড়উদ্দিন, আরও অনেকে আসতেন। বাসায় গানের অনেক সরঞ্জাম ব্যবহৃত হতো যেমন হারমোনিয়াম, তবলা, তানপুরা।

আব্বা ছিলেন ৮ সন্তানের জনক। আমাদের সবার ছোট ভাইকে জন্ম দিয়ে আমাদের মা না ফেরার দেশে চলে যান। আব্বা আমাদের সকল ভাই-বোনকে সুশিক্ষিত করেন। আমাদের তিন বোনকে ভারতেশ্বরী হোমসে ভর্তি করিয়ে দিলেন। প্রতি মাসের শেষ রবিবার ভিসিটিং ডে তে আব্বা আমাদের হোমসে দেখতে আসতেন। সাথে করে ফল-মূল ও নিত্য-জিনিসপত্র আনতেন। মাঝে মধ্যে আব্বা আমাদের জন্য বাটা জুতোর বাক্স ভর্তি খেলনা, পুতুল নিয়ে আসতেন। আমরা কিছুক্ষণ আব্বার সাথে পুতুল নিয়ে খেলতাম। আব্বা আমাদের লেখাপড়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্যগত খোঁজ-খবর নিতেন। আমাদের নখ কাটা, দাঁত মাজা, চুল বাঁধা, পোশাক ইত্যাদি সম্পর্কে পরামর্শ নির্দেশনা দিতেন।

রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুলের কোয়ার্টারে আমাদের বাসা ছিল। ছুটিতে বাসায় আসলে আব্বা আমাদের তিন বোনকে কার্বলিক সাবান দিয়ে গোসল করিয়ে দিতেন। উলেখ্য, হোমসে প্রায়শই খুজলি-পাঁচড়া ও মাথার উকুন হতো। আব্বা

এই-সব নিরাময়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেন। যেমন নারিকেল তেলের সাথে নীল মিশিয়ে খুজলিতে লাগিয়ে দিতেন যা খুব জ্বালাময় ছিল। উকুনের জন্য নেপথলিন গুঁড়ো করে নারিকেল তেলের সাথে গুঁড়ো মিশ্রিত করে আব্বা চুলে মাখিয়ে দিতেন।

মাছ খাওয়ার সময় আব্বা নিজে কাঁটা বেছে দিতেন। ভোরে ফজর নামাজের শেষে আমরা আব্বার সাথে মর্নিং ওয়াকে যেতাম। সংসদ ভবন ও রমনা পার্ক এলাকায় আমরা হাঁটতাম। ছুটির দিনে সকালে কায়দা পড়া ও গলা সাধা হতো। আব্বা নিজেও হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতেন এবং আমাদেরকেও গান শেখাতেন। ছোট ভাই তবলা বাজাতো। আমি বা অন্য ভাই-বোনরা কেউ তানপুরা ধরতাম। আমার আব্বা একজন দয়াবান, সমাজসেবক ও উদার হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। আমার আব্বা প্রায়শই গ্রাম থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা করতে সাহায্য করতেন, এমনকি বাসায় থাকতে দিতেন ও আর্থিক সহযোগিতা করতেন।

স্বাধীনতার যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে, ২৮শে এপ্রিল ১৯৭১ সনে আব্বা ছোট ভাই দুলালকে সাথে নিয়ে টাকা তোলার জন্য মোহাম্মদপুরের সোনালী ব্যাংকে যান। কিন্তু আর ফিরে আসেননি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানা যায় উনারা মোহাম্মদপুরের বিহারীদের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। আল্লাহতাআলা সবার কাছে আমাদের শ্রদ্ধেয় আব্বা ও স্নেহের ছোট ভাই দুলালকে বেহেস্ত নসীব করুন।

আব্বা, তোমাকে আমরা অনেক ভালবাসি। তুমিই আমাদের অভিভাবক, তুমিই আমাদের অহংকার। তোমার কাছে আমরা চির ঋণী। আলাহ্ তোমাকে ভালো রাখুন। আমিন।

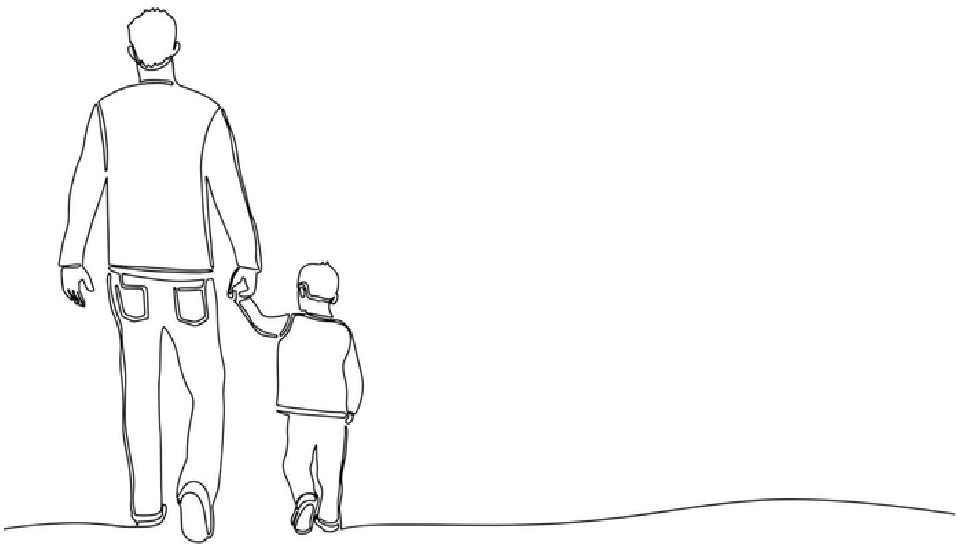

আমজাদ হোসেন'এর

বাবা, আমার প্রিয় বাবা!

"বাবা" শব্দটা শুনলেই সবার আগে মনে পড়ে এক পরম ভালোবাসা, লুকিয়ে থাকা এক গভীর আবেগ, আর পরম শ্রদ্ধার এক নাম। বাবা শুধু একটি শব্দ নয়; এর ভেতরে মিশে থাকে নিরাপত্তা, নির্ভরতা, ভালোবাসা আর না-বলা হাজারো অনুভূতি। অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম, বাবাকে নিয়ে কিছু লিখব। কিন্তু সময় করে আর হয়ে ওঠে না। আসলে লেখালেখি সবার দ্বারা হয় না; এর জন্য আলাদা একটা মনোযোগ, একটা মানসিক প্রস্তুতি লাগে। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে বসার মতো করে বাবাকে নিয়ে লেখা যায় না এখানে তো যুক্তির চেয়ে আবেগের ওজন অনেক বেশি। হঠাৎ একদিন মাহবুব ভাই আমাকে বললেন, বাবা দিবস উপলক্ষে কিছু একটা লিখতে। কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কেন যেন আমার চোখে পানি চলে এলো। বাবা, তোমাকে নিয়ে লিখব কত স্মৃতি, কত আবেগ, কত ভালোবাসা, কত শ্রদ্ধা! এতসব অনুভূতির প্রকাশ আমি কীভাবে করব?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল নিউটনের তৃতীয় সূত্রের কথা" প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।" ভাবলাম, আমার চোখে যখন বাবাকে মনে করে এত জল আসে, তার মানে নিশ্চয়ই আমার বাবা আমার জন্যও জীবনে কত অশ্রু ফেলেছেন হয়তো এখনো ফেলেন। পুরুষ মানুষ হয়তো চোখের জল সহজে প্রকাশ করে না। বাইরে থেকে শক্ত থাকে, কিন্তু ভেতরটা যে কতটা ভেঙে যায়, সেটা কে জানে! বাবার সেই অশ্রুগুলো হয়তো মেঘনা কিংবা পদ্মার মতো প্রশস্ত নয়; বরং করতোয়া নদীর মতোই আঁকাবাঁকা পথে বয়ে গিয়ে চোখের আড়ালে হৃদয়ের ভেতর ক্ষরণ হয়ে যায়। আজ এই কথাগুলো লিখতে গিয়ে ছোটবেলার হাজারো স্মৃতির ভিড় থেকে একটা স্মৃতি খুব স্পষ্ট হয়ে সামনে ভেসে উঠল।

২০০০ সালের দিকে আমার বড় ভাই প্রথমবারের মতো সৌদি আরব যাচ্ছিল। ভাইয়ের বয়স তখন খুব বেশি নয় সম্ভবত ১৮-২০ বছর। ফ্লাইট ছিল রাতে। যথারীতি সময় হলে ভাই চলে গেল। ভাইকে বিদায় দেওয়ার সময় মা অনেক কান্নাকাটি করেছিলেন, ভাইও কেঁদেছিল। আমি কেঁদেছিলাম কি না, ঠিক মনে নেই। তখন তো ছোট ছিলাম; হয়তো বুঝতেই পারিনি বিচ্ছেদের কষ্ট কতটা। কিন্তু একটা বিষয় আমাকে সেদিন ভীষণ অবাক করেছিল আমি বাবাকে কাঁদতে দেখিনি। মনে হয়েছিল, বাবা বুঝি পাথরের মানুষ! যেন ইস্পাত দিয়ে তৈরি। বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে আমি অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তারপর আমরা বিমানবন্দর থেকে বাড়ি ফিরে এলাম। সবাই যার যার মতো ঘুমিয়ে পড়ল। বাবা ঘুমিয়েছিলেন কি না, আজও জানি না। ফজরের নামাজের পর বাবা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না।

> পুরুষ মানুষ হয়তো চোখের জল সহজে প্রকাশ করে না। বাইরে থেকে শক্ত থাকে, কিন্তু ভেতরটা যে কতটা ভেঙে যায়, সেটা কে জানে! বাবার সেই অশ্রুগুলো হয়তো মেঘনা কিংবা পদ্মার মতো প্রশস্ত নয়; বরং করতোয়া নদীর মতোই আঁকাবাঁকা পথে বয়ে গিয়ে চোখের আড়ালে হৃদয়ের ভেতর ক্ষরণ হয়ে যায়।

সে কী কান্না! হৃদয়বিদারক, আকাশভাঙা কান্না। মুহুর্মুহু কান্নায় মনে হচ্ছিল, কোনো কোকিল যেন তার প্রিয় সঙ্গীকে হারিয়ে প্রকৃতিকে জানাচ্ছে তার শোকের কথা। সেদিন বাবার কান্নায় আমার মনে হয়েছিল, যেন ভোরের সেই সকালটাও কাঁদছে। পুরো ঘরটা আমার কাছে কেমন ভারী হয়ে গিয়েছিল। সেই ছোট্ট বয়সেও দৃশ্যটা আমার মনে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে, এত বছর পরও চোখ বন্ধ করলে আমি বাবাকে সেইভাবেই দেখতে পাই। বাবার সেই কান্না আজও আমার চোখের সামনে ভাসে। ২০১৭ সালে যখন প্রথমবার স্কলারশিপ নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া যাই, তখন আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছিল "বাবা কি আমার জন্যও সেদিনের মতো কেঁদেছিলেন?" হয়তো কেঁদেছিলেন। হয়তো এখনো কাঁদেন।

বাবার সঙ্গে আমার দেখা হয় না প্রায় আট বছর হলো। এত বছর দূরে

থেকেও বাবার কাছে আমি এখনো সেই ছোট্ট ছেলেটাই রয়ে গেছি। সেই ছেলেটা, যার জন্য বাবা হয়তো আজও অপেক্ষা করেন "কবে আসবে?" বাবা প্রায়ই একটা কথা বলেন "যেদিন বাবা হবি, সেদিন বুঝবি বাবা কাকে বলে।" আজ আমারও দুই সন্তান। বাবার কথার সেই গভীর অর্থ এখন একটু একটু করে বুঝতে পারি। সন্তানকে ভালোবাসা কতটা গভীর, কতটা নিঃশর্ত নিজে বাবা হওয়ার পরই যেন বাবাকে নতুন করে চিনতে শুরু করেছি। আমরা চার ভাই-বোনের মধ্যে একমাত্র আমিই দেশের বাইরে থাকি। তাই বাবা যে আমাকে কতটা মিস করেন, তার একটা ছোট্ট উদাহরণ আছে। প্রথমদিকে আমি ভাবতাম, মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বললেই তো হলো। মা তো আমার সব খবর বাবাকে দেন। মাঝেমধ্যে বাবার সঙ্গেও কথা হয়। আমরা যারা প্রবাসে থাকি, হয়তো অনেকেই এভাবেই ভাবি।

কিন্তু একদিন বাবা বললেন, "তুমি তো শুধু তোমার মাকে ফোন দাও। আমার ফোনে তো আর ফোন দাও না!" কথাটা শুনে আমি থমকে গেলাম। তারপর বুঝলাম, বাবা আসলে শুধু ফোন চাননি। তিনি হয়তো বলতে চেয়েছিলেন "তুই আমাকে আলাদা করে একবার ফোন দে বাবা। তোর কণ্ঠটা শুনি। বল, কেমন আছিস। আর একবার বল বাবা, কেমন আছো? তুই কবে আসবি?" সেদিন থেকে বাবাকে আমি আলাদা করে ফোন করি। কারণ এখন বুঝি মায়ের কাছে আমার খবর নেওয়া আর বাবার কাছে আমার কণ্ঠ শোনা এক জিনিস নয়। বাবা হয়তো খুব বেশি কিছু চান না। শুধু চান, তার সন্তান তাকে মনে রাখুক। মাঝে মাঝে ফোন করুক। আর দূরদেশ থেকে একবার বলুক "বাবা, আমি ভালো আছি।"

যাদের বাবা নেই, তারা জানেন জীবনের কত বড় একটা বটবৃক্ষ আমরা হারিয়ে ফেলি বাবাকে হারানোর সঙ্গে সঙ্গে। আর যাদের বাবা এখনো আছেন, তারা সত্যিই ভীষণ ভাগ্যবান। আমরা যারা বাবাকে এখনো "বাবা" বলে ডাকতে পারি, আমাদের চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কে আছে?

তাই পৃথিবীর সব বাবারা বেঁচে থাকুন সন্তানের অকৃত্রিম ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আর সম্মান নিয়ে। আর দিন শেষে আমাদের সবার মুখে যেন উচ্চারিত হয় "রব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগিরা।"

বাবা, তুমি ভালো থেকো। সুস্থ থেকো। অনেক অনেক বছর বেঁচে থেকো। তোমার সেই ছোট্ট ছেলেটা হয়তো আজ অনেক দূরে, কিন্তু তোমার হৃদয়ের খুব কাছেই আছে। ভালবাসি

মামুন আলা'র

আমার বাবার ভাষাবিলাস

আমার আব্বা, আবুল আলা সিরাজুল হক, প্রথম জীবনে ছিলেন একজন টাইটেল পাশ মাওলানা; পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন এবং আইনবিদ্যাও অধ্যয়ন করিয়াছেন। অতি সাধারণ পরিবারে জন্ম লইয়া ছাত্রাবস্থায় লজিং থাকিয়া বড় হইয়াছেন। ১৯৬৫ সনে, মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে, বড়লোকের মেয়ে আমার মাকে বিবাহ করিলেও শ্বশুরবাড়ি হইতে বিশেষ কিছু গ্রহণ করেন নাই।

চাকুরি করিতেন ভূতাত্তিক জরিপ দপ্তরে। চাকুরিটি খুব বড় ছিল না, কিন্তু অফিসের ডিজি হইতে পিয়ন পর্যন্ত সকলেই জানিতেন "মৌলানা সাহেব" একজন পণ্ডিত ব্যক্তি।

এমন সুন্দর বাংলা, ইংরেজি ও আরবি হাতের লেখা আমি আর কাহারও দেখি নাই। আব্বা গর্ব করিয়া বলিতেন, তিনি সাতটি ভাষা জানিতেন। আমি গুনিয়া দেখিয়াছি, ছয়টি বাংলা, ইংরেজি, আরবি, ফারসি, উর্দু ও হিন্দি। সাত নম্বরটি কী, কোনো দিন বুঝিতে পারি নাই। একদিন জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "এই ছয়টা মিলাইয়া আমি আমার নিজের একটা ভাষা বানাইয়াছি উহাই সাত নম্বর।"

১৯৭৫ সালের মধ্যেই, মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে, তিনি চার সন্তানের পিতা। নিজের বাবা ও সৎমাকে দেখভাল করিয়াছেন, সৎ ভাইবোনদেরও মানুষ করিয়াছেন। বিদ্যাবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও পরিবারের এত দায়িত্বের মধ্যে ছোট চাকুরি ছাড়িয়া বড় কোনো চাকুরির পেছনে ছুটিতে পারেন নাই। অথচ সেই যোগ্যতা তাঁহার ছিল।

আব্বার সংগ্রহে ছিল অসংখ্য বই- আরবি, ফারসি, বাংলা ও ইংরেজি। আমাদের বারবার বাসা বদলাইতে হইত। আসবাবপত্র বলিতে তেমন কিছুই ছিল না; কিন্তু ছিল দুইটি বড় ট্রাঙ্কভর্তি বই। আব্বার গর্ব ছিল ওই বইগুলি লইয়াই। চার ভাইবোনের মধ্যে আমি ছিলাম আব্বার "ড্রিম চাইল্ড"। ফলে তাঁহার ভাষাপ্রীতি আমার শৈশবকে বেশ বিপদসংকুলও করিয়া তুলিয়াছিল।

আমি যখন ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে পড়ি, আব্বা আমাকে রাজশেখর বসুর চলন্তিকা বাংলা-টু-বাংলা অভিধান কিনিয়া দিয়াছিলেন। একজন মাওলানা হইয়াও ছেলেকে রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে পড়াইতে তাহার কোনো দ্বিধা ছিল না। আমার কাছে ইহা তাহার অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল মানসিকতার একটি সুন্দর পরিচয়। চতুর্থ শ্রেণির আর কয়জন ছাত্র বাংলা-টু-বাংলা অভিধানের সঙ্গে পরিচিত ছিল, তাহা জানি না। আমার ইংরেজি শিক্ষার জন্য আবার কোথা হইতে ১৮৮৪ সালের, পৃষ্ঠা হলদে হইয়া যাওয়া, একটি ব্যাকরণের বই জোগাড় করিয়াছিলেন। অফিসে যাওয়ার সময় কয়েক পৃষ্ঠা দেখাইয়া বলিয়া যাইতেন, "এগুলি বাংলায় অনুবাদ করিস।" কখনো দৈনিক পত্রিকা হাতে ধরাইয়া বলিতেন, "এই খবরটা ইংরেজিতে অনুবাদ কর।" আরবি ব্যাকরণও শিখাইতেন। কোনো কোনো দিন হঠাৎ ঘোষণা দিতেন, "আজকে তুই আমার সঙ্গে শুধু আরবিতে কথা বলবি।" আমি তখন আমার "টারজান" মার্কা আরবি দিয়া কোনোমতে দিন পার করিতাম।

> বিখ্যাত মনীষীদের উদ্ধৃতি ছিল আব্বার হাতে এক মারাত্মক অস্ত্র। কোনো ভুল করিলে শুধু বকুনি খাইয়াই রেহাই ছিল না; বিখ্যাত সব গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি শুনাইয়া তাহার মর্মার্থ বুঝাইয়া এমনভাবে ভর্ৎসনা করিতেন যে লজ্জায় আমার দুই কান লাল হইয়া যাইত।

বাড়িতে কত রকমের পত্রিকা যে রাখা হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। দৈনিক ইত্তেফাক, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ইংরেজি ডেইলি অবজারভার, এনায়েতুল্লাহ খানের সম্পাদিত হলিডে। আমি যখন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ি, তখন কবি আহসান হাবীব সম্পাদিত শিশু-কিশোরদের পত্রিকা কিশোর বাংলাও আসিত।

ইংরেজি পত্রিকা দেখিয়া আম্মা কখনো কখনো বিরক্ত হইতেন। বলিতেন, "ঠিকমতো বাজার করতে পারো না, ইংরেজি পত্রিকার পেছনে এত টাকা খরচ করো! তোমার পোলা কি এগুলি পড়ে?" আব্বা গর্বিত কণ্ঠে বলিতেন, "আরে, একটু একটু পড়ে এখন, এতেই যথেষ্ট। একদিন ও ভাষা বিক্রি করেই খাবে!"

চতুর্থ শ্রেণি হইতেই স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য আব্বা আমার বক্তৃতা লিখিয়া দিতেন। সেই বক্তৃতায় আরবি, ফারসি ও ইংরেজি উদ্ধৃতি থাকিত। মাঝে মাঝে মঞ্চে স্ক্রিপ্ট ভুলিয়া গেলে নিজের মতো করিয়া বলিতে হইত। এইভাবেই অষ্টম-নবম শ্রেণিতে উঠিতে উঠিতে বক্তৃতা ও বিতর্ক আমার সহজাত অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল। পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে বক্তৃতার জন্য যে সামান্য সুনাম অর্জন করিয়াছি, তাহার বীজও আব্বাই বপন করিয়াছিলেন।

আয় অল্প ছিল, কিন্তু বাড়তি আয়ের জন্য কোনো শর্টকাট বা অসৎ পথ খুঁজিতে দেখি নাই। নিজের নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। আমাদের নিজে পড়াইতেন। আমার পড়ার টেবিলের সামনে বড় কাগজে লিখিয়া টাঙাইয়া দিয়াছিলেন, **Simple Living, High Thinking.**

পড়ানোর সময় শাসন ছিল কঠোর। সেই শাসনের সঙ্গে চলিত কোরআন-হাদিস, বেদ, বাইবেল, রুমি, শেখ সাদি, ইকবাল ও গালিব হইতে অবিরাম উদ্ধৃতি। বিখ্যাত মনীষীদের উদ্ধৃতি ছিল আব্বার হাতে এক মারাত্মক অস্ত্র। কোনো ভুল করিলে শুধু বকুনি খাইয়াই রেহাই ছিল না; বিখ্যাত সব গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি শুনাইয়া তাহার মর্মার্থ বুঝাইয়া এমনভাবে ভর্ৎসনা করিতেন যে লজ্জায় আমার দুই কান লাল হইয়া যাইত।

আর ভুল বানানের প্রতি আব্বার ছিল প্রবল অ্যালার্জি। একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না। সেই কারণে সারা জীবন বানান ভুল করিতে আমার ভিতরে একধরনের আতঙ্ক কাজ করিয়াছে। একবার "**German**" লিখিতে গিয়া **G**-এর জায়গায় **J** লিখিয়াছিলাম; আরেকবার "দূরত্ব" বানানে ভুল করিয়াছিলাম। দুইবারই প্রচণ্ড পিটুনি খাইয়াছিলাম। এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাংলা বানানের শ্রী দেখিলে প্রায়ই আব্বার কথা মনে পড়ে। ভাবি, আমি এইসব বানান লিখিলে তাহার হাত হইতে আমার রক্ষা ছিল না!

আব্বাকে লইয়া বলিবার মতো আরও অনেক কথা আছে। আমার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস **Rising from Ashes**-এ তাহার অনেকটাই লিখিয়াছি। আজ বাবা দিবসে শুধু এইটুকুই বলি আব্বার পাণ্ডিত্য হয়তো তাহার নিজের জীবনে প্রাপ্য মূল্য পায় নাই; কিন্তু আমার এবং আমার ছোট ভাই ড. মাহমুদ উল আলার জীবনে তাঁহার সেই বিদ্যার প্রভাব গভীর।

আব্বার ভাষাপ্রীতির কারণেই স্কুল-কলেজে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রায় সবসময়ই ভালো ফল করিয়াছি। পরবর্তী সময়ে **IELTS**-এ উচ্চ স্কোর করা কিংবা অস্ট্রেলিয়ায় **NAATI** পরীক্ষায় প্রথমবারেই উত্তীর্ণ হওয়া, এইসব অর্জনের ভিত বহু আগেই আব্বা তৈরি করিয়া দিয়াছিলেন।

আব্বার খুব শখ ছিল একদিন তাজমহল দেখিবেন। সেই সাধ আর পূরণ হয় নাই। ২০১৬ সালের ১২ জুলাই তাজমহল না দেখিয়াই তিনি পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

আজ আমি যখন বিভিন্ন মহাদেশের নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়াই, তখন আব্বার কথা মনে করিয়া একদিকে দুঃখ হয়, অন্যদিকে গর্বও হয়। মনে হয়, ভাষার যে ছোট ছোট বীজ তিনি বহু বছর আগে আমার ভিতরে বপন করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার ফল নিয়াই আজ আমি পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

আব্বা, আপনি ভালো থাকুন। রব্বির হামহুমা কামা রব্বাইয়ানি সাগিরা।

শাহনাজ বিথী'র

আমার সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়

বাপি মানে আমার কাছে খুব আরামের একটা নিরাপদ ঘর, যে ঘরটাতে চাইলেই যখন-তখন ফেরা যায়; যে ঘরটাতে কেবল ভালোবাসা আর নিরাপত্তার উষ্ণতা। বাইরের পৃথিবীতে যতই ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে যাক না কেন, এই ঘর থেকে তার কিছুই টের পাওয়া যায় না। একজন সন্তানের জীবনে হয়তো তার বাবাই সবচাইতে বড় নায়ক, আমার কাছে যেমন আমার বাপি।

সেবার বর্ষায় প্রচুর পানি জমে গেল নানাবাড়ির চারপাশে। আমরা কয়েক ভাই-বোন মিলে খুব দুষ্টুমি শুরু করলাম সেই পানিতে। স্কুল ছুটি, তাই বেশ কয়েকজন খালাতো ভাই-বোন একসঙ্গে হয়েছি নানাবাড়িতে। আমি সেদিন বোধহয় একটু বেশিই দুষ্টুমি করেছিলাম, তাই পানিতে পড়ে গিয়ে প্রায় ডুবতেই বসেছিলাম! আমার নানি না দেখলে হয়তো সেদিনই হতো আমার জীবনের শেষ দিন। কিন্তু আমি যে বেঁচে আছি সেটা যতটা না বিস্ময়ের, তার চেয়েও বড় বিস্ময় হলো সেদিন ঠিক দুপুরবেলাই বাপি নানাবাড়িতে এসে হাজির! কারণ, তিনি গত রাতে স্বপ্নে দেখেছেন আমি নাকি পানিতে পড়ে গেছি! এই হলো আমার বাপি। যত বড় হয়েছি, ততই দেখেছি কেমন করে যেন তিনি জেনে যান ঠিক যখনই আমি খারাপ থাকি।

খুব মনে পড়ে, আমাদের ছোটবেলায় টেলিভিশনে ভূতের একটা ইংরেজি ধারাবাহিক হতো। সেই ভূতের ধারাবাহিক তো দেখতেই হবে আমাদের তিন ভাই-বোনের! কিন্তু দেখতে ইচ্ছে করলে কী হবে, ভয়ও তো লাগে! তাই আমরা তিনজনই বাপির কোলের মধ্যে ঢুকে গুটিশুটি মেরে সেই ধারাবাহিক দেখতাম। কারণ, ভূতের সাধ্য নেই আমার বাপির সামনে আসার! ঠিক তেমনি করেই জীবনের প্রতিটি ক্ষণে এই মানুষটা আমাদের তিন ভাই-বোনকে আগলে রেখেছেন, এখনো নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছেন।

আরেকদিনের গল্প বলি। শুক্রবার সকালবেলা আমরা সবে নাশতা শেষ করে লিভিং রুমে বসে আড্ডা জমাচ্ছি আমরা বলতে আমরা দুই বোন আর মামণি। ঠিক সে সময় এক যুবক মিষ্টি নিয়ে হাজির আমাদের বাসায়। যুবক মামণিকে বললেন, "মা, আমি বিসিএস পাস করেছি। বাবা কি বাসায় আছেন?" মামণি আর আমরা দুই বোন একটু অবাক কে এই যুবক, আর আমাদের বাপিকে 'বাবা' বলে ডাকছেই বা কেন?

পরে সেই যুবকের মুখেই জানতে পারলাম, দরিদ্র ঘরের এই ছেলেটিকে আমাদের বাপি লেখাপড়ার খরচ দিতেন সেই তার স্কুলজীবন থেকে! আজ সে দেশের প্রথম শ্রেণির সরকারি চাক-রিজীবী। অথচ বাপি কোনো দিন আমাদের বলেননি যে তিনি এভাবে কাউকে সাহায্য করেছেন। আজও নীরবে কতজনকে যে সাহায্য করে যান এই মানুষটা! গর্বে আমার বুক ভরে যায়, শ্রদ্ধা বেড়ে যায় বহুগুণ। আমার বাপি এমনই এক মানুষ, কাউকে সাহায্য করার সামান্যতম সুযোগও তিনি হাতছাড়া করেন না। ভালোবাসায় ভরা বিশাল একটা মন আছে তাঁর।

> একজন বাবা হয়তো তাঁর সন্তানকে মায়েদের মতো গর্ভে ধারণ করেন না, কিন্তু তিনি ধারণ করেন তাঁর হৃদয়ে। সন্তানের জন্য বাবাদের ত্যাগ, শ্রম আর চেষ্টা সবই যেন একেকটা অলিখিত মহাকাব্য! আমরা কেউ হয়তো সেই মহাকাব্যগুলো দেখি না, অথবা দেখেও বুঝি না।

আমরা দুই বোন শাড়ি পরলে বাপি খুব মন খারাপ করতেন। মামণিকে বলতেন, "আমার মেয়েগুলো কেমন বড় হয়ে যাচ্ছে... ওরা তো আমাদের ছেড়ে চলে যাবে।" মামণিকে সব সময় বলতেন, "আমার মেয়েদের বেশি বেশি আদর করবে, সবচেয়ে ভালো খাবারটা ওদের দেবে; কারণ ওরা তো আমাদের কাছে বেশি দিন থাকবে না।"

আমার বিয়ের সময় বাপির মুখের দিকে আমি তাকাতে পারছিলাম না। বাবারা চোখের জল লুকাতে পারলেও বুকের ভেতর জমে থাকা ঝড়টা বোধহয় কোনোভাবেই লুকাতে পারেন না। আমার গায়েহলুদের দিন আমি বারান্দায় পা পিছলে আছাড় খেলাম কাঁচা আলপনায়। তা দেখে আমার বাপির সে কী রাগ! কেন কেউ খেয়াল করল না, আমি কেন পড়ে গেলাম!.

আমার বিদায়ের পর ঘরের দরজা বন্ধ করে চিৎকার করে কেঁদেছিলেন আমার বাপি। আমি জানি, সেই কান্না এখনো নীরবে তাঁর বুকের মধ্যে রয়ে গেছে।

বাবারা হয়তো কখনো মুখ ফুটে ভালোবাসার কথা বলেন না, কিন্তু তাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের সবটুকু দিয়ে। একজন বাবা হয়তো তাঁর সন্তানকে মায়েদের মতো গর্ভে ধারণ করেন না, কিন্তু তিনি ধারণ করেন তাঁর হৃদয়ে। সন্তানের জন্য বাবাদের ত্যাগ, শ্রম আর চেষ্টা সবই যেন একেকটা অলিখিত মহাকাব্য! আমরা কেউ হয়তো সেই মহাকাব্যগুলো দেখি না, অথবা দেখেও বুঝি না।

পৃথিবীর সকল বাবার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা। ভালো থাকুক পৃথিবীর সব বাবা।

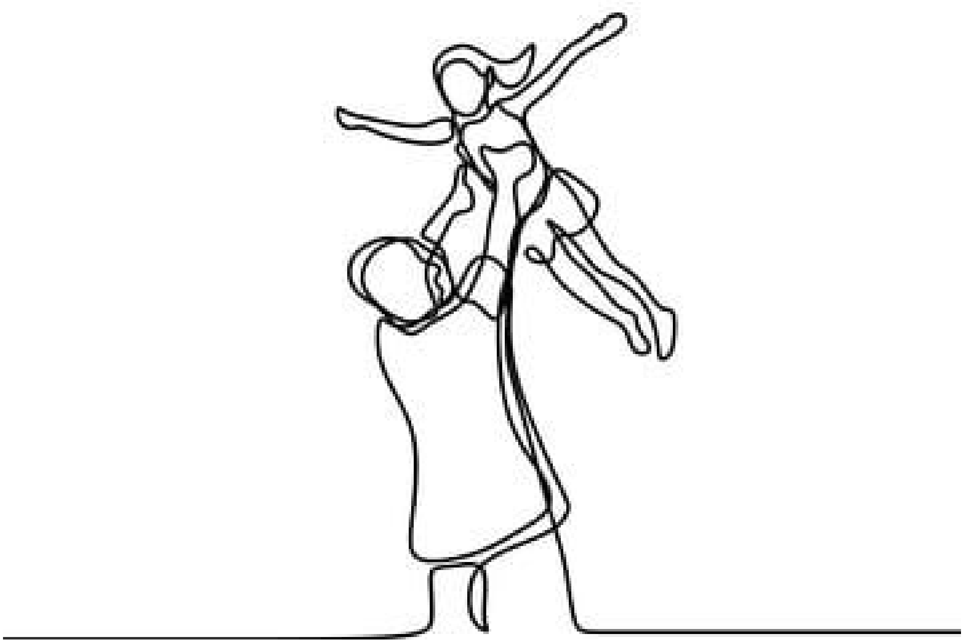

ডঃ মোঃ ইউনুস' এর

বাবা দিবসে আমার আব্বা: কিছু স্মৃতি কথা

আমি বাবাকে "আব্বা" বললেও উনি আমাকে আদর করে বলতেন আব্বাজান। অর্থ হলো বাবা বা পিতা, এটি স্নেহ প্রকাশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত আঞ্চলিক বা গ্রামীণ শব্দ। আমিও আমার বাবাকে আব্বাজান বলতাম আদর করে। আমার বাবা ও চাচাও আমাকে আদর করে আব্বাজান বলতেন।

আমার বাবা: ডা: এম, এ, কে ফজলুল হক এর জীবন ছিলো এক বন্যাঢময় জীবন। বাবার শিক্ষাজীবন শুরু হয় পাবনার সুজানগর উপজেলার খলিলপুর স্কুল থেকে। আমার দাদা ছিলেন গ্রাম্য মাতব্বর, যার সখ্যতা ছিল নোবেল বিজয়ী জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের সাথে। রবীন্দ্রনাথ আমার চাচা: অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন ও আমার বাবা ডা: ফজলুল হকের থাকার ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিয়ে তাদের পড়াশুনার সুযোগ করে দেন কলকাতাতে। বাবা পড়েছেন ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে আর চাচা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

চাচার আর বাবার মধ্যে একটি গভীর আত্মিক সংযোগ ছিল, একজন ছিলেন আরেকজনের পরিপূরক।

আমার চাচা বাংলাদেশের সব বড় বড় সম্মাননা পেয়েছেন (একুশে পদক, স্বাধীনতা পদক, বাংলা একাডেমি পদক)। বাবা সারাজীবন নিঃস্বার্থ ভাবে ভাইকে সাহায্য করে গেছেন। তার বিখ্যাত বই 'হারামণি', 'ইরানের কবি' ও 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' এই গ্রন্থগুলির প্রধানতম তথ্য/উপাত্তের উৎস ছিলেন আব্বা। বাবা চাচাকে ২২ খণ্ডের শাহনামা উপহার দেন যা ছিল চাচার গবেষণার বিষয়বস্তুর উৎস।

আব্বা পাঁচ বছর বয়সে মাতৃহারা হন। চাচা বাবাকে অভিভাবক বাবা মায়ের স্নেহ দিয়ে রবীন্দ্র পরিবারের সহায়তায় বড় করেন। মেডিকেল কলেজের পড়াশুনাও এভাবে সম্ভব হয়।

আব্বা সারাজীবন ডাক্তার হিসাবে সরকারী চাকরি করেছেন। আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং সাধ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি ঢাকাতে স্থায়ী না হয়ে পরিবার নিয়ে পাবনায় স্থায়ী হন। আমার জন্ম কিশোরগঞ্জে যখন আব্বার কর্মক্ষেত্র ছিল কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতাল।

আব্বা ৬০এর দশকে ফরিদপুর জেলের ডাক্তার ছিলেন। সেখানে তিনি শেখ মুজিবকে জেলে সেই জেলে যখন শেখ মুজিব বন্দী ছিলেন তখন আব্বা তাকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। জেল হাসপাতালে ভর্তি করা থেকে শুরু করে তার জন্য মশারি, বালিশ ও খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন নিজ দায়িত্বে। শেখ মুজিব তাকে ডাকতেন 'হক সাহেব' সম্বোধনে। পরবর্তীতে শেখ মুজিব ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করলেও আব্বা কখনো কোন দাবী বা চাহিদা নিয়ে তার কাছে হাজির হননি। একইরকম ভাবে তিনি পাবনা জেল ডাক্তার হিসেবে কমরত অবস্থায় ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে আপগ্রেড করেন বিশেষ বন্দী হিসাবে যাতে তিনি উন্নত চিকিৎসা ও সুযোগ সুবিধা পান। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যখন সবাই নিজের স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত, আব্বা ছিলেন একজন ব্যতিক্রম এবং আত্মসম্মানে বলীয়ান ব্যক্তি। তিনি কখনোই তাঁদের কাছে কোন প্রয়োজনে হাত পাতেননি।

আমরা নয় ভাইবোন। ছোটবেলা থেকেই আব্বার প্রধান উপদেশ ছিলো যে পড়াশুনা ছাড়া আমাদের গতি নাই, পড়াশুনা করে বড় হতে হবে। আমরা ভাইবোনেরা সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তাই করেছি মনোযোগ দিয়ে।

আমার দুই ভাই দুই বোন ডাক্তার, এবং বাকিরা সবাই মাস্টার্স ডিগ্রীধারী, আমি ডক্টরেট সমাপ্ত করতে পেরেছি। মাসের শুরুতে সবার আগে তিনি টিউটরদের বেতন পরিশোধ করতেন। তিনি ছেলেমেয়েদেরকে পুষ্টিকর ও তাজা খাবার খাওয়ানোর ব্যাপারে খুবই উদ্যোগী ছিলেন। বাসায় এক সময় তিনি তিনটি সিন্ধি গরু পালতেন, যাতে আমরা ভাইবোনেরা খাঁটি দুধ আর ঘরে তৈরী ঘি খেতে পারি।

শাকসবজী ফলানোর ব্যাপারে ছিলো তার বিশেষ উৎসাহ, নিজ হাতে বাগান করতেন। অবশ্য আব্বা জেল এবং পুলিশের ডাক্তার হওয়ায় কয়েদিরা নিয়ম করে গরু পালনে এবং বাগানের পরিচর্যায় তাঁকে সাহায্য করতেন প্রতিদিন।

পদ্মা নদী অঞ্চলে ছিলো আমাদের বাস। আব্বার যোগাযোগ ছিল জেলেদের সাথে যারা পাবনার বিলের তাজা মাছ আর পদ্মার ইলিশ মাটির হাড়িতে করে নিয়মিত আমাদের পাবনার বাসায় নিয়ে আসতেন।

তখন ফ্রিজ এর চল ছিলোনা, মা জ্বাল দিয়ে দিয়ে সেই মাছ সংরক্ষণ করতেন। আমাদের প্রিয় খাবার ছিলো খিচুরি আর জ্বাল দেয়া ইলিশ মাছ। আব্বার খেলাধুলার ব্যাপারেও ছিলো তার উৎসাহ, বল ও খেলাধুলার সামগ্রী কিনে দিতে কখনো কার্পণ্য করেন নি। আমি জুনিয়র রেড ক্রস ও স্কাউটে খুব সক্রিয় ছিলাম, প্রধানতঃ আব্বার উৎসাহে। আবার স্কুলে ঈদ এ মিলাদুননবীতে রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতেও উৎসাহ ও সহযোগিতা দিতেন। মনে পড়ছে আমি টেবিলে বসে লিখছি আর আব্বা বিছানায় বসে প্রচণ্ড গরমে হাতপাখা দিয়ে নিজেকে এবং আমাকেও বাতাস করছেন আর কিভাবে রচনা লিখতে হবে তা বলছেন।

সকালে ফজরের নামাজের জন্য সব ভাইবোনকে ডেকে তুলতেন, নামাজ শেষ হলে মা নিয়ে আসতেন সামোবারে তৈরী চা সাথে নাড়ু, খই, মুড়ি আর সবরি কলা বা গাছের বিচি কলা। সেই সূত্র ধরে আজও আমার দিন শুরু হয় কাকডাকা ভোরে।

ইন্টারমিডিয়েটে পড়ার সময় আমি জড়িয়ে পড়ি ছাত্র রাজনীতিতে। বাবা স্বাভাবিক ভাবে খুব উদ্বিগ্ন হন আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে। তিনি আমাকে অনুপ্রাণিত করেন ঢাকায় গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে। আমি যখন কোচিং করার জন্য ঢাকায় ভাইয়ের বাড়িতে যাই, উনি নিজে তদারকি করে তৈরী করা সেগুন কাঠের পড়ার টেবিলটি গাড়িতে তুলে দেন। এতগুলো ভাইবোনকে বড় করতে যেয়ে আব্বাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। উনি বিশ্বাস করতেন যেহেতু উনি সরকারি চাকরি করেন, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা অনুচিত। আমরা ভাইরা পুলিশদের রেশনে পাওয়া খাঁকি কাপড় (যে আব্বা তাঁর অর্দালির মাধ্যমে সংগ্রহ করতেন) দিয়ে তৈরী প্যান্ট আর সস্তা টেট্রন কাপড় (কসকো থেকে কেনা) এর শার্ট পরতাম। খুব ছোটবেলাতেই সততার ও মূল্যবোধের শিক্ষা আব্বার কাছে পেয়েছি যা আমরা ভাইবোনেরা বহন করে চলেছি।

আজ পেছন ফিরে অনুধাবন করি আমার জীবনের সমস্ত প্রাপ্তিই এসেছে আমার বাবার অনুপ্রেরণা থেকে।

একনজরে আমার বাবা: ডাঃ এম, এ, কে ফজলুল হক
মল্লিকপুর স্কুলে শিক্ষা ঘোষণা, সুজানগরের গোবিন্দপুর গ্রামে
ক্যাম্পবেল মতিঝিল স্কুল, শিয়ালদাহ, ডাক্তারি পড়াশুনা
মিটফোর্ড হাসপাতালে কর্মজীবনের শুরু
চাকরীস্থান: জাহিদান, ইরান এ্যাসিস্ট্যান্ট ডাক্তার
মিটফোর্ড হাসপাতালে ডাক্তার
কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতাল
ফরিদপুর সদর হাসপাতাল
পাবনা সদর হাসপাতাল
পাবনা পুলিশ লাইন হাসপাতাল ও পাবনা জেল ডাক্তার
স্থায়ীবাস পাবনা সদরে কাছারিপাড়া মহল্লায়
মৃত্যু ১৯৮৫ ৪ঠা নভেম্বর, কাছারীপাড়া, পাবনা সদর

*ছবি: আমার বাবা ডা: এস এ কে ফজলুল হক (ডানে), আমার মা জোহরা ফজলুল (বামে), আমার বোন ডা: আফিয়া ফজলুল (বসা)

ছোটবেলায় কোন এক দিন...
কোন এক ক্ষণে...
বাবা বলেছিলো "বাবা হ... বুঝবি" ...।
ছোট বেলা থেকে চেষ্টা ছিলো তোমার মতো হবার,
কিন্তু আজ বাবা হয়েও তোমার মতো হতে পারিনি।
শিখতে পারিনি.. অনেক কিছুও...
কিন্তু একটা কথা খুব ভালোভাবে জানি..
জীবনের সব যুদ্ধে হেরে গিয়ে,
যদি পেছন ফিরে তাকাই, দেখবো..
তুমি আছো- থাকবে নীরবে- নিঃশব্দে।
তাই এখনো মাঝে মাঝে তোমায় বুঝতে পারিনা...
তুমি আসলে কি?

আপনার, আমার - সবার কথা...
আমাদের কথা Australia
amaderkotha.com.au অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত মাল্টিকালচারাল অনলাইন নিউজপেপার